ত্রিবেণী-সঙ্গম

প্রস্থানে

১—রং

শীত কাটিয়া গেল, বসন্ত আসিল। বসন্ত বাতাসে আবার সেই তিরোহিত পরিমল। ধরণীর অঙ্গে আবার সেই পরিত্যক্ত আভরণ। কুসুম কলিকাতে আবার সেই উপভুক্ত শোভা। শিশুর বদনে আমার শৈশবের প্রথম হাসি, যাহা মিলাইয়া গিয়াছে। যুবকের প্রাণে আমার প্রথম যৌবনের অরুণ আশা, যাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। শীতের অবসানে প্রকৃতি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু এ পরা পোষাকে আমাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমীরণ একদিন এ জীবনে বহিয়াছিল, সে বাতাসে কত সোণার স্বপন ভাসিয়া আসিল, স্বপ্নঘোর চক্ষে ধরিত্রী সুন্দর দেখাইয়াছিল। কিন্তু আজ এই বহা বাতাসে আমার মোহ আসে না। বিশ্বছবি তেমন সুন্দর হইয়া আমার নয়নে ভাসে না।

কিন্তু সে রঙ্গীন আভা না আসিলেও এ বাতাসে এ
সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এ বাতাস সুখে হোক, দুঃ
হোক, চেতন অচেতন সকল পদার্থকে জাগাইয়া তুলি
জানে। সকলকে ক্লীবতা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমি
আজ উত্থিত হইয়াছি।

আমি মরি নাই। আমি যেন গতবর্ষের একটি শু
পত্রের ন্যায় সরোবরপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম। যেন আমা
প্রাণ অঙ্গারস্থিত প্রচ্ছন্ন অগ্নিকণার ন্যায় আমার মধ্যে মি
মিটি জ্বলিতেছিল। বসন্তঋতুর আবাহনে সবাই জাগিয়াছে
তাই আমিও জাগিয়াছি। তাহারা বসন্ত উৎসবে মাতি
উঠিয়াছে, আমি দুঃখ লইয়া বেদনাতে জাগিয়াছি।

আজ যেন কোন মহাপুরুষের বোধনের নিমিত্ত কো
মহাসভায় বহুবিধ রাগিনীর আলাপ সূচনা হইতেছে
আমি যেন বীণার ছিন্নতন্ত্রীর ন্যায় সুরভ্রষ্ট হইয়া একপাশে
পড়িয়া আছি। উৎসববাদ্যের নহবতে আমার তা
মিলাইতে পারিলাম না।

তাই আজ একপ্রান্তে এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া
জীবনের পূর্ববকাহিনী অনুরাগভরে কল্পনা করিতে করিতে
প্রাণ করুণরসে সিঞ্চিত হইয়া আসিল। একটি পূর্ববশ্রুত
সুর কাণে বাজিতেছিল—

কিসের কুহকে মন
মরণের বিমোহন
ছায়া করে আলিঙ্গন
আবেগ ভরে।

সাধ কিরে হবে পূর্ণ,
পরাণ যে শক্তিশূন্য,
আশারে করেছি চূর্ণ
নিরাশার ভারে!

এমন সময়ে অভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—কেন কাঁদ? যাহা কালসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ছায়াময়ী কল্পনার দ্বারা কি জীবনসমস্যার ভঞ্জন হইবে?

আমি কেন কাঁদি! শুনিবে কেন কাঁদি? আমার প্রাণের রূপ দেখিতে পুনরায় সাধ হইয়াছে। কুসুমে কমনীয়তা আছে, কোকিলে কুহুস্বর আছে, সমুদ্রগর্ভে মুক্তা আছে, আকাশে নক্ষত্র আছে, বসুন্ধরায় সম্পদের অভাব নাই; এত থাকিতেও এ প্রাণের দর্পণ মিলিল না, তাই এ ক্রন্দন। প্রাণের স্বরূপ মিলিল না যদি, তবে কেন বিশ্ব অসুন্দর হইল না। কেন বা চিরশ্রান্তিবোধ আসিল না, বিরাগ জন্মাইল না। কই, তাহা ত হইল না।

আজও কেন তনু মন যৌবনেতে ভরা,
শ্যামল-পল্লব-লতা-প্রস্ফুটিতা ধরা !
পূর্ণিমা রজনী কেন, আকাশে চাঁদিনী,
কুলুস্বরে কেন বহে অদূরে তটিনী !

তারা দেখিয়া দেখিয়া নয়ন আজও দৃষ্টিরহিত হয় নাই, কুসুমের কমনীয় পরশে অঙ্গ অবসন্ন হয় নাই, (Narcissus) নারসিসাসের মত স্বচ্ছ স্বভাবদর্পনে আপন প্রতিবিম্ব *দেখিতে দেখিতে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারি নাই। হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বানলে আপনাকে দগ্ধসাৎ করিতে* পারিলাম কই ? অবিনাশী অমর আমি। অনন্ত জীবন সম্মুখে। অনন্ত পিপাসা প্রাণে। আমার অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার কোথায় ? অনন্ত দ্রষ্টা আমি, আজীবন দেখিব কাহাকে ? অনন্ত জ্ঞাতা আমি, আমার অনন্ত জ্ঞেয় কই ?

যদ্যপি বিনষ্ট হইলাম না, তবে প্রাণের স্বরূপকে স্থায়ী করিতে পারিলাম না কেন ? নতুবা প্রাণের রূপ দেখিব কেমনে ? প্রাণের প্রতিরূপকে নির্ব্বাতনিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায় ধরিয়া রাখিব কি প্রকারে ? প্রাণময়ের স্থিতি-স্থাপকতা ঘুচিবে কিসে ? প্রাণ থাকিতে ধৃতি কোথায় ?

কৈলাসে মহাদেবও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, রূপবাসনা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষ মূর্ত্ত

বাসনার প্রতিরূপ মনসিজকে চিরতরে ভস্মীভূত ও আত্ম-রতিকে অনাথা করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। মধ্যযুগের দান্ত-কবি (Dante) দান্তেরও প্রাণকে জানিবার সাধ হইয়া-ছিল। তিনি স্বর্গের বিয়াট্রিস (Beatrice) কল্পনা করিয়া অপার্থিবে পার্থিব তৃষ্ণা মিটাইলেন। কিন্তু কৈলাসের সে যোগবল, মধ্যযুগের সে কৌশল, আজ কোথায়? ধ্যানে বা অপার্থিব কল্পনায় প্রাণের রূপ দর্শন করিয়া থাকিতে *পারি কই? আজ এ যুগের যাত্রীদের সে প্রাচীন মার্গ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ ঘটিলে আমরা শান্তিভঙ্গ করি, প্রত্যক্ষ ও কল্পনায় সংগ্রাম বাঁধিলেই* বিগ্রহের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলি। আর আমরা অসত্যের সহিত রফা করিতে রাজী নই। সর্ব্বসত্যকে, সর্ব্ব-দেবতাকে, আমরা ইচ্ছাময়রূপে জানিয়াছি। আজ আমিই বিশ্বের কেন্দ্র। বিশ্বে লীন হইতে পারি না। আকাশের চাঁদ যেমন কিরণধারা বিস্তারে শূন্যের সকল দিক, সকল প্রান্ত, ছাইয়া ফেলিলেও শূন্যে বিলীন হইতে অসমর্থ।

এই বিশ্বরূপ ও আত্মচৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনি-র্ব্বচনীয়। কৃষ্ণপক্ষে আঁধার রাতে খদ্যোতপুঞ্জের সন্তরণ দেখিয়াছ কি? মনে কর সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন খদ্যোত-সঙ্কুল শূন্যসাগরই বিশ্বরূপ, ও অগণন খদ্যোতের প্রত্যেকটিই

যেন সেই আঁধার সাগরে সন্তরণকারী জীব। খদ্যোতের দেহনিঃসৃত তেজঃপদার্থ যেন জীবের চৈতন্য। মাঝে মাঝে খদ্যোত জ্বলিয়া উঠে ও আপনার প্রদীপ্ত প্রাণের আগুনে স্বসত্তা ও স্বাধারকে একাকার করিয়া দেয়। আবার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, স্ফুলিঙ্গ হইতে পুনরায় খদ্যোতে পরিবর্ত্তিত হয়। অথবা বাষ্পীয় পোতের চক্র যেমন মগ্নোত্থিত হইতে হইতে সমুদ্রের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া যায়, বিশ্বরূপ ও জীবচৈতন্যের সম্বন্ধও সেইরূপ।

হে আমার বিশ্ব, একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া তোমার সহিত একাকার হইয়াছিলাম। সেদিন যেন আকস্মিক উল্কাপাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কই, সর্ব্বদা ত জ্বলিতে পারি না। প্রাণের আগুন যে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়া যায়। না জ্বলিলে তোমার সহিত মেশা যায় না। আজ প্রাণের আগুন নিবিয়া গেছে। তাই আঁধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই তুমি ও আমি উভয়েই আঁধারে! সেই ভাল। আঁধারে থাকিয়া আলোকের মহিমা বোঝাই ত ভাল। সব যদি আলোকময় হয়, আঁধার থাকিবে কোথায়? আঁধার না থাকিলে জ্বলিবে কে? চক্ষু ফুটিবে কা'র? হে বিশ্ব, তোমার আঁধার রাতে খদ্যোত যদি বারে বারে জ্বলিয়া না উঠিত, তবে অমাবস্যার নিশাকে

আলোক প্রদান করিত কে? শুধু আগুন করি
ইন্ধনও চাই। শুদ্ধপ্রেম উদ্দীপক অভাবে অন্তর রূ
কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়? প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়
মান অভিমানের অভাবে প্রেম কোথায় অবস্থান চন্দ্র
সূর্য্যের কিরণ যদি তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরকে চুম্ব
না করিত, তবে বর্ণভঙ্গিমা কোথায় ফুটিয়া উঠিত?

এই বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। এই যে ভগবা
অক্ষয় সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই যে ভবের হা
*বসিয়া গিয়াছে, এই যে বিচিত্র রঙ্গ বেরঙ্গ মেলা, ইহা কবে
কোথা হইতে আসিল! কেমনে এক অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণ,
অরূপী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপে প্রতিভাসিত হইল!* যেমন
সমান্তরাল সমান আয়তনের দুইখানি দর্পণের মধ্যে কোন
ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে, সেই ব্যক্তির আকৃতি একখানি
দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, পরে দর্পণগত বিম্ব অপর দর্পণে
প্রতিফলিত হয়, এবং সেই বিম্বপ্রতিবিম্বের প্রতিভাসক্রিয়া
অনন্ত ধারায় অনন্তকাল চলিতে থাকে, ভগবান ও জীবের
ভবলীলাও কি সেইরূপ?

আজ আমি এই দর্পণে নিজের প্রাণের প্রতিরূপ
দেখিতে চাই। আমার প্রাণের রূপ মিলিল না বলিয়া আমি
কাঁদি।

যেন সেই আঁধার সাগরে সন্তরণকারী জীব। খদ্যোতের দেহনিঃসৃত তেজঃপদার্থ যেন জীবের চৈতন্য। মাঝে মাঝে খদ্যোত জ্বলিয়া উঠে ও আপনার প্রদীপ্ত প্রাণের আগুনে স্বসত্তা ও স্বাধারকে একাকার করিয়া দেয়। আবার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, স্ফুলিঙ্গ হইতে পুনরায় খদ্যোতে পরিবর্ত্তিত হয়। অথবা বাষ্পীয় পোতের চক্র যেমন মগ্নোত্থিত হইতে হইতে সমুদ্রের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া যায়, বিশ্বরূপ ও জীবচৈতন্যের সম্বন্ধও সেইরূপ।

হে আমার বিশ্ব, একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া তোমার সহিত একাকার হইয়াছিলাম। সেদিন যেন আকস্মিক উল্কাপাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কই, সর্ব্বদা ত জ্বলিতে পারি না। প্রাণের আগুন যে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়া যায়। না জ্বলিলে তোমার সহিত মেশা যায় না। আজ প্রাণের আগুন নিবিয়া গেছে। তাই আঁধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই তুমি ও আমি উভয়েই আঁধারে! সেই ভাল। আঁধারে থাকিয়া আলোকের মহিমা বোঝাই ত ভাল। সব যদি আলোকময় হয়, আঁধার থাকিবে কোথায়? আঁধার না থাকিলে জ্বলিবে কে? চক্ষু ফুটিবে কা'র? হে বিশ্ব, তোমার আঁধার রাতে খদ্যোত যদি বারে বারে জ্বলিয়া না উঠিত, তবে অমাবস্যার নিশাকে

আলোক প্রদান করিত কে? শুধু আগুন চলে না, ইন্ধনও চাই। শুদ্ধপ্রেম উদ্দীপক অভাবে অনাথ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়? প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়সংঘর্ষণে মান অভিমানের অভাবে প্রেম কোথায় অবস্থান করে? সূর্য্যের কিরণ যদি তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরকে চুম্বন না করিত, তবে বর্ণভঙ্গিমা কোথায় ফুটিয়া উঠিত?

এই বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। এই যে ভগবান অক্ষয় সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই যে ভবের হাট বসিয়া গিয়াছে, এই যে বিচিত্র রঙ্গ বেরঙ্গ মেলা, ইহা কবে কোথা হইতে আসিল! কেমনে এক অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণ, অরূপী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপে প্রতিভাসিত হইল! যেমন সমান্তরাল সমান আয়তনের দুইখানি দর্পণের মধ্যে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে, সেই ব্যক্তির আকৃতি একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, পরে দর্পণগত বিম্ব অপর দর্পণে প্রতিফলিত হয়, এবং সেই বিম্বপ্রতিবিম্বের প্রতিভাসক্রিয়া অনন্ত ধারায় অনন্তকাল চলিতে থাকে, ভগবান ও জীবের ভবলীলাও কি সেইরূপ?

আজ আমি এই দর্পণে নিজের প্রাণের প্রতিরূপ দেখিতে চাই। আমার প্রাণের রূপ মিলিল না বলিয়া আমি কাঁদি।

আমার প্রাণের রূপ দেখিতে আমার সাধ হইয়াছে কেন, সে রূপ কি আমার মুখচ্ছায়ায়, অঙ্গকান্তিতে প্রকাশিত নয়? আমার আকৃতিতে, অঙ্গসৌষ্ঠবে, অক্ষি নহে? তাই যদি হয়, তবে একখানা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়।

কিন্তু কই, তাহা ত হয় না, নয়ন নিজের রূপ দেখিয়া তৃপ্তি পায় না। নয়ন কখনও পশ্চাদ্দর্শী নয়, আনতপল্লবও নয়, সদাই সম্মুখদর্শী। বর্ত্তমানের বেষ্টনী? এ জীবনে যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সমাজের যে রীতিনীতি-সংস্কারপ্রণালীতে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আমার সমসাময়িক ভাবস্রোত যাহা রক্তপ্রবাহের ন্যায় অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, সে সকলই ত আমার অন্তর্গত। অতীতের ইতিহাস? আমিই ত অতীতের প্রতিনিধি, সেই অতীতের আশ্রয় ত আমারই কল্পনা, আমারই স্মৃতি। তবে তাহাতে আর জানিবার আছে কি? দেখিবার আছে কি? যাহা দেখিয়াছি তাহা আর দেখিব না; যাহা শুনিয়াছি, তাহা আর শুনিব না। সে যে নিজেরই উপাসনা, নিজেরই ভজনা। নয়ন অপরের নয়নে, অন্তর অপরের অন্তরে, আপনাকে প্রতি-বিম্বিত দেখিতে চাহে। কেবল প্রকৃতিদর্পণ, কেবল অতীতের স্ফটিক গোলক, লইয়া চলে না। প্রত্যেকেই

তাহার স্বজাতির রূপে আপন স্বরূপ অনুসন্ধান করিয় বেড়ায়। তাই স্বজাতির সহিত না মিলিলে প্রাণের রূপ *দেখিব কেমন করিয়া ?*

*বসন্তের ফুল ফোটে ও ঝরিয়া পড়ে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য মাসের পর মাস, বরষের পর বরষ, আসে যায়, সৌর-*জগতের পর সৌরজগত জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠে, ভাসে ও মিলায়। কিন্তু এ আবর্ত্তও এক চিরন্তন ধারার অন্তর্ভূ্ত। অনাদি অনন্ত কালপরম্পরায় যে ধারা আছে, মাস, ঋতু, বর্ষ তাহারই অঙ্গ। বসন্তের ফুল তাহারই অলঙ্কার। আমি কোন্ ধারা হইতে অংশে অংশে নিত্য নূতন বেশে গমনাগমন করিতেছি ? আমার ধারা কোথায়!

প্রাণই প্রাণের স্বজাতি। তবে প্রাণবিশিষ্টের সমষ্টিই কি আমার ধারা ? কে সে বিশ্বপ্রাণ ? কোথায় সে প্রাণময় ?

সাংখ্যদর্শনে বলে যে একই শক্তি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া, পরে বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চেতনের প্রেরণায় ক্রমনিয়মানুসারে অণুপরমাণু তৃণলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতর দিয়া, সর্ব্বশেষে মানব দেহে প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থান করে। এবং পুনরায় স্বভাবের নিয়মে বিপরীত ধারায় জড়ে পরিণত হয়। মানব সেই

মহাশক্তির আবর্ত্তনে আদি ও অন্তের সংশ্লেষস্থল। জানি না কোন্ স্রোতে কোন্ পথে ভাসিয়া আসিয়াছি, তবে একদিন আমার জাগ্রৎ চৈতন্য বিপরীত গতিতে সেই প্রাণময়ের সন্দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সাংখ্য-যোগে যাহাকে "প্রকৃতিলয়" বলে আমার কি সেই যোগাবস্থা ঘটিয়াছিল? না—সেদিন প্রকৃতি আমায় গ্রাস করে নাই। প্রাণময়েই প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে নয়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল।

আজ সেই অতলস্পর্শ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছি। আজ বন্যাস্রোতে ভাসমান হইয়া কিনারায় ঠেকিয়াছি, এই মাত্র পারে উঠিয়াছি।

সম্মুখে দেখি নূতন জগৎ, যেন এক বিরাট হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে! এই বিরাট প্রাণীসমষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া এ কোন্ মহাপ্রাণী কালপথে মহাযাত্রা করিয়াছে! এই মানব ইতিহাসের ধারা, কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় চলিতেছে? ব্যোমমার্গে ঐ তারকামণ্ডলের ধারা, আর মর্ত্তে এই সমাজজীবনের ঐতিহাসিক ধারা। ইহাই মহাপ্রয়াণের প্রশস্ত পথ! আমি এই মহাযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই দিশাহারা, বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম।

আজ বুঝিতেছি এই বিচিত্র বিশ্বধারার সহিত অন্তরের

আদর্শের সামঞ্জস্যে দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্বপরম্পরার ন্যায় একটী জীবনধারা সৃজন করিতে হইবে। এমনি করিয়াই বিশ্বদর্পণে প্রাণের রূপ প্রতিফলিত হয়, ও এক অখণ্ড অনন্ত ধারা সৃজন করে! ইহাই প্রাণের শিল্প-কৌশল! এতদিন বসিয়া বসিয়া স্বভাব-লীলা দেখিলাম, আজ আর রঙ্গাভিনয়ে দর্শক নহি। আজ আমি অভিনয়ে সূত্রধার। অথবা আজ আমি শিল্পী। ভাঙ্গিতে আসিয়াছি। ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আজ এই ভগবদ্দত্ত বিশ্বস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহাদ্বারা কোন অপূর্ব্ব বস্তু রচনা করি। চিত্রকর পটে রং ফলাইবার জন্য তুলি ধারণ করেন। ভাস্কর খনিজ পদার্থ দিয়া মূর্ত্তি গঠন করেন। আমার এই অভিনব শিল্পে অচেতন পদার্থ উপকরণ নয়। বিশ্বপ্রাণই আমার উপাদান। আমি এই চেতন পদার্থ দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিতেছি, তাহা কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিবে না, তাহার রস কেহ উপভোগ করিবে না। আমি সাকার পদার্থ দিয়া নিরাকার গড়িয়া তুলিতেছি। তাহা বিশ্ব-মানবের জন্য নহে। তাহা বিশ্বপতির স্থাপত্যাগারে এক কোণে স্থান পাইলেই আমার শিল্পচেষ্টা সার্থক হইবে।

রসই শিল্পীর প্রাণ। কিন্তু এই রস, এই প্রাণ, যে নিরাকার। শিল্পী যখন তাহার শিল্পবস্তুটিকে গড়িতে থাকে,

তখন সে ত রসের কথা, প্রাণের স্বরূপ, একেবারেই ভাবে না, ধ্যান চক্ষেও দেখে না। সে যে জ্ঞানান্ধ। চিত্রকর ও রং যে আলাহিদা, চিত্রকরের সে জ্ঞানও থাকে না। সে শুধু ঐ রংএর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নানা রং লইয়া মিলাইতে থাকে; কখনও সাদা, কাল, লাল, কখন নীল, সবুজ, হল্‌দে, কখন মেটে, কমলা, গোলাপী, আর এই মিলাইতে মিলাইতে পটের উপর তুলি দিয়া আঁচড় কাটিতে থাকে, আঁচড়ের পর আঁচড়, টিপের পর টিপ, ও এইরূপে আগে দেহের কাঠাম, তারপর মুখ, পরে হাত পা যোগ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে চোখ নাক ফুটাইয়া তুলে, ও অবশেষে কেমন করে কোথা হতে এক ছন্দোবদ্ধ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি ওই পটের উপর প্রাণময় হইয়া জাগিয়া উঠে। আমিও আজ নানা রং মিলাইয়া এক নূতন রং সৃষ্টি করিতেছি। তাই আমাকে রংএর সহিত রং সাজিতে হইবে। রঙ্গীন না হ'লে রংরাণী হইব কেমনে? এই জগতের সকল রং লইয়া, সাদা ও কাল, মেটে ও উজ্জ্বল, সৎ ও অসৎ, কুৎসিত ও সুন্দর, সকল রংএ আমার রং মিশাইয়া, সকল রাগ আমার রক্তে রঞ্জিত করিয়া, এক অভিনব চিত্রকলা সাধন করি।

তাই বলি বর্ণভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আমি

রঙ্গীন নই। সৃষ্টিও যে লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা। চিত্রকর যেমন চিত্রের রংএ রংএ প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্ব-ছবির বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায়, নীলে সবুজে, সাদায় কালোয়, ফিকে ঘোরে, মেটে উজ্জ্বলে সেই শিল্পী রংএ রং মিলাইয়া আছেন। তিনি যে রংরাজ!

মন, কর সেই শিল্পের সাধন। একদিন এই শিল্প সাধনা করিতে করিতে এমন এক মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবেন। তখন আমার শিল্পাগারের কাজ হইতে অবসর মিলিবে। সেই দিন এই ভাঙ্গাগড়ার ভার, এই গড়িয়া তোলার ভার, সেই বিশ্বশিল্পীর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিব। তিনি ভাঙ্গিতে থাকুন, গড়িতে থাকুন, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এই বিশ্বব্যূহ রচনা করিতে থাকুন। আমি কেবল বসিয়া বসিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মার হাতের কৌশল দেখিব।

তাই আজ বিশ্বস্তূপের একপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহার দ্বারা কোন অপূর্ব্ব শিল্পবস্তু রচনা করি।

২—ধোঁয়া

আমি খেয়ালী মানুষ, খেয়ালে চলি। আমার স্থিরতা নাই। যখন যে বস্তুতে আপনাকে পাই, তাহাকে ধরি ও ইচ্ছা হইলেই আবার তাহাকে ছাড়িয়া যাই। আমার নিত্য নূতন অভিরুচি। আমি যাহাকেই ধরি তাহাকেই গ্রাস করি। আর তখন তাহার জন্য আমার প্রাণের মায়া কাটিয়া যায়। তাই সেই বস্তুতে আর আমাতে কোন চির-সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু "দুই" না হইলে আবার প্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা একবার আমার জ্ঞানে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ভিতর অজানা কিছু নাই, যাহার ভিতর আর কোন রহস্যের স্বাদ পাই না, তাহাতে আমার প্রাণের দোসর মিলে না, তাহাকে আমি "দুই" বলিয়া ধরিতে পারি না। যাহা পাইবার নয়, যাহা জানিবার নয়, তাহার প্রাপ্তির ও জ্ঞানের বাসনাই আমার ভোগের পথ, আর ভোগের শেষে জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, তাই আমি নিত্য নূতন অজানার আশ্রয়ে আপনাকে অসীম করিয়া রাখি। আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড়কে ভোগ করিতে গিয়াই বড় হইয়া উঠি। তাই এই ধরা ছাড়া, অজানাকে জানা, অসীমকে সসীম করিয়া তোলাই, আমার জীবন। ভোগেই জীবন পাওয়া যায়। ভোগই বৃদ্ধির কারণ।

আমি শুধু বস্তুতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হই না। আমি আগুনের মত তাহাকে বেড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেই বস্তুটিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। এই পোড়াইয়া ছাই করাই ত্যাগের পথ, সংহারের পালা।

আমার যেমন ভোগ ও ত্যাগে বৃদ্ধি, বিশ্ব-প্রাণের বৃদ্ধিও তেমনি এই ভোগের ভিতর দিয়া। বিশ্বানল নিরন্তর বিশ্ববস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতেছে ও ভস্মসাৎ করিতেছে, আর সেই ভস্মেই নূতন সৃষ্টির বীজ। ভোগ-ত্যাগ-সৃষ্টি, ইহাই বিশ্বাগুনের বিশ্ব লইয়া খেলা।

জগতে এই ভস্মাবশেষ হইতেই যত সৃষ্টি, এই ক্ষয় হইতেই যত বৃদ্ধি। জঙ্গল পুড়িয়া কি আবাদী জমি তৈয়ারী হয় না? প্রাণীদেহ পুড়িয়াই ত সার হয়। এই পোড়া না হইলে কৃষক জমিতে সার দিত কিসে? নবীন ধানের অঙ্কুর গজাইত কেমনে? আবার পোড়া মাটিতেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। শুধু অন্ন নয়, শুধু আশ্রয় নয়, যত কলা-সৌন্দর্য্যও এই পোড়া লইয়া। ভূগর্ভের তাপে পোড়া যে ধাতু ও শিলা, তাহাই ভাস্করমূর্ত্তির উপাদান। খনিজ কয়লার রূপান্তরই বর্ণ-কলার উপকরণ। তাই বলি দাহই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আগুন ও ইন্ধনে চলে না। তাহাদের সমাবেশে যে ভস্মের উদয় হয়, তাহাও আবশ্যক।

সেই কারণেই বুঝি আগুন কখনও একেবারে নিবে না। কোথায় না কোথায় জ্বলে। আর এই অবিশ্রাম জ্বলার দরুণই জগতে ছাইএর রাশি এমন অমর অক্ষয়! হায়! তাই বুঝি আমার প্রাণের আগুনও বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতে চায়। তাই আজও আমার প্রাণের আগুন নির্ব্বাপিত হইল না। আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া এ কোন্ ভস্মস্তূপ গড়িয়া তুলিতেছি?

এই ভস্ম লইয়াই মানব-ইতিহাস। অতীতের পোড়া লইয়া বর্ত্তমানের কত সৃষ্টি, কত কৌশল! পুরাকালের ধ্বংসাবশেষে দেখি নূতনের উদয়। এই পোড়ামাটির উর্ব্বরতা গুণেই, এই ধ্বংসে নূতন সৃষ্টির বীজ থাকে বলিয়াই, একটি রোমের উপর আর একটি রোম, একটি *দিল্লীর উপর আর একটি দিল্লী, যেন ধাপে ধাপে আকাশ পানে উঠিতেছে। তাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রোম, ও প্রাচ্যে* দিল্লী, Eternal City হইয়া রহিয়াছে। পুরাতন জয়স্তম্ভ, পুরাতন মন্দির, ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়াই কত কুতবমিনার, কত শাস্তা সোফিয়া (Santa Sophia) মস্‌জিদ, কত শাস্তা মেরিয়া (Santa Maria) গির্জ্জা, নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রাচীন (Coliseum) কলিসিয়মের ভগ্নস্তূপেই যে রোম নগরীতে কত নব্য

হর্ম্যাবলির মহল দরদালান স্তম্ভতোরণাদি গঠিত হইয়াছে ! আর তাই বুঝি রোমের কলামূর্ত্তিতে আজও সেই (Coliseum) কলিসিয়মের শোণিত-পিপাসা জ্বলিতেছে ! বিলাসের উত্থান, সেও শ্মশানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দেখিয়াছি প্রাচীন বিলাসভবন পম্পেয়ীর (Pompeii) দগ্ধাবশেষে নবীন বিলাসপত্তন নেপ্‌ল্‌স্‌ (Naples)এর রাজপ্রাসাদ সজ্জিত। কিন্তু এ অট্টালিকাও ধূলিসাৎ হইয়া, হয়ত একদিন (Vesuvius) ভেসুভিয়সের ভস্মেই আচ্ছাদিত হইয়া, ভবিষ্যৎ বিলাসের বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। গ্রীসীয় ও রোমীয় ভাস্করগণ ভূগর্ভস্থ পোড়াধাতু ও শিলার দ্বারাই কত দেবমন্দির, কত নাট্যশালা, কত ডোরীয় (Dorian) ও করিন্থীয় (Corinthian) স্তম্ভমালা, কত সৌম্যগম্ভীর *বিরাট জুপিটার (Jupiter Olympus), কত ভাস্বর বিবস্বান্‌ আপলো (Apollo), কত ঊর্ম্মি-উত্থিতা নগ্নস্নাতা* অফ্রোডাইটি (Aphrodite) মূর্ত্তি রচনা করিল। কালে তাহা ভূমিসাৎ হইল, পুড়িয়া ছাই হইল, মাটির সঙ্গে মাটি হইল, ও কালে তাহাই পুনরুত্থিত হইয়া (Renaissance) রেনেসাঁসে নূতন কলামূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার সেই রেনেসাঁস-প্রবর্ত্তিত শিল্পসাধনা আজ কি নূতন শিল্পের সূচনা করিয়া রাখিতেছে না ? যুগযুগান্তর ধরিয়া কত জাতির পর

জাতি, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, সাহিত্যের পর সাহিত্য, শিল্পের পর শিল্প, সভ্যতার পর সভ্যতা, একে একে ইতিহাসের আকাশে অস্ত যাইতেছে। আবার কি, নক্ষত্রের পর নক্ষত্রের ন্যায়, নূতন জাতি, নূতন সাম্রাজ্য, নূতন সভ্যতা, সেই আকাশে উদিত হইতেছে না? তাই ইতিহাসের প্রতিরূপ সেই (Arabia Felix)আরবের ফিনিক্স্(Phœnix). ঐতিহাসিক আকাশে অস্তাচলের আগুনে আজ যে ভস্ম হইয়াছে, কাল আবার সেই ভস্মের আগুন হইতেই একটি অরুণ নবজীবনের উদয় হইবে। না পুড়িলে নবজীবনের অভ্যুদয় নাই।

জড় জগতেও এক বিরাট আগুনের ক্রিয়া। নদী বহিতে বহিতে শুকাইয়া যায়, সাগর ভরিয়া উঠিতে উঠিতে স্থলে পরিণত হয়, পর্ব্বতশিলাও ক্ষয় হইয়া একদিন সমতল হইয়া পড়ে, আবার যে স্থান পূর্ব্বে সমতল ছিল, কালে সেখানে তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শৈলশিখর দেখা যায়। এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে ক্ষয়বৃদ্ধি, ইহাও এক আগুনের খেলা। সে আগুন কেবল পোড়াইয়া ছাই করে না, কিন্তু এক নূতন সৃষ্টির বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যায়। সেই বীজ হইতেই বসুমতী রত্নগর্ভা।

তাই বলি এই যে ভূগর্ভে স্তর রচনা, ভূপৃষ্ঠে জল ও

স্থূলের সমাবেশ, এই যে জড়রাজ্যে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে, ইহা তবে এক বিপুল অগ্নিকাণ্ড বই নয়। এ কোন্ দাবানল পার্থিব সকল বস্তুকে বেড়িয়া কখনও মিটি মিটি কখনও বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে? আর এ জ্বলার ত শেষ দেখি না! ইহার আদি জানি না! ঐ যে আকাশে নীহারিকার উৎপত্তি, কোন্ তাপের বলে? আবার কোন্ আগুনের ধক্‌ধক্ তাড়নায় সেই নীহারিকাই আকাশপথে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়া নক্ষত্ররূপে যেন স্থির হইয়া যায়? আবার পাতালে দেখ, বসুন্ধরার হৃদয় কোন্ জ্বালার জ্বলনে আর না পরিয়া যেন মাটি ফাটিয়া জ্বলন্ত স্রোতে বহিয়া যায়? কোন্ আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বসুন্ধরাকে রত্নগর্ভা করে?

সেই আগুনই কি উদ্ভিদ্-জগতে প্রাণরূপে জ্বলিতেছে না? তৃণ লতা বৃক্ষ, বীজ অঙ্কুর ফল, কি সেই প্রাণ-আগুনে জ্বলিয়াই কাঁচা পাকা বর্ণে রঞ্জিত নয়? শুধু সবুজ নয়, নানা বর্ণ নানা ভঙ্গিমায় প্রতিভাসিত হইতেছে। আগুনের লোল-জিহ্বাতে যেমন নানা প্রকার বর্ণের অস্ফুট আভাস-রেখা দেখা যায়, সেইরূপ এই বসুন্ধরার দেহে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, সেই তাপের উদ্ভাবনী শক্তিতে নানাবিধ বর্ণের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই

আকাশে এমন নীলিমা, এমন ধবলিমা, এমন অনির্ব্বচনীয় রক্তিমা, আর তাই ধরণী-অঙ্গে কত সবুজ হল্‌দে গোলাপি লাল এমন রঙ্গাইয়া উঠিতেছে, কখনও কচিহরিৎ কখনও বা পাকা ধানের স্বর্ণপীত! কিন্তু হায়! থাকিয়া থাকিয়া কেন এ আগুন নিবিয়া যায়! তখন ত আর কোনও রঙ্ দেখা যায় না। সব আঁধার হয়ে আসে! তখন সেই মায়াবিনী, দেহের উজ্জ্বলশ্রী তামস আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া, যেন ধরণীর গর্ভে আশ্রয় লন। তাই বলি যত রঙ্‌এর মেলা, যত আলো আঁধার, সেই আগুনের প্রাণে।

শুধু বিরাট অগ্নিকাণ্ড নয়। প্রতি জীবে এক একটি আগুনের ফুল্‌কি। এই আগুনই দেহীর প্রাণ, জীবের চৈতন্য। হৃদয়-গহ্বরে ধক্ ধক্ করিয়া দহরাগ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ আগুনও দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলে।

পীঠস্থানভেদে এ আগুন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করে। সেমিরামিস্, আলেক্‌জান্দর, সার্লেমেন, নেপোলিয়নের হৃদয়ে এই আগুনের শিখাই বিজয়িনী-মূর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অসংখ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনপদ দগ্ধ করিয়াও সেই বিজয়িনী প্রতিমার লোল-জিহ্বার অনন্ত পিপাসা মিটিল না। তাই করালী আজ (Kaiser Wilhelm) কাইজের বিল্‌হেল্‌মের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়া দাবানলে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সাগরমন্থনে সমবেত সুরাসুরগণের সমক্ষে এই অগ্নি-শিখাই মোহিনীর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অগ্নি-শিখাই রাবণের হৃদয়ে সীতা, পারিসের হৃদয়ে হেলেন, আণ্টনির প্রাণে ক্লিওপেট্রার রূপ। তাহাতেই লঙ্কা ও ট্রয় দগ্ধ, তাহাতেই রোমরাজ্য বিধ্বস্ত। ভিন্ন ভিন্ন পীঠস্থানে এই আগুনই কালী করালীরূপে জ্বলিয়া উঠে, কখনও শীত কখনও উষ্ণ, কখনও রক্ত কখনও কৃষ্ণ। ওফিলিয়াতে শীত, আণ্টনিতে উষ্ণ, রোমিয়ো'য় রক্ত, ওথেলো'য় কৃষ্ণ। কে এই করালীর পীঠস্থান গণনা করিতে পারে!

এই আগুনই চিতার আগুন, শ্মশানে শ্মশানে জ্বলিয়া জ্বালাইয়া নিঃশেষ হয়। প্রাণ-বায়ু প্রাণময়ে, দেহ মাটিতে মিশায়, আর আগুন শূন্যে মিলাইয়া শূন্য হইয়া যায়। ইহাই শান্তিপথ, ইহাই শুদ্ধিমার্গ। প্রাণাগ্নিই একমাত্র পাবক। এই আগুনে পুড়িয়া যে ভস্ম হয়, তাহাই পূত, তাহাই শান্ত, তাহাই শিব।

এই যে দাবানল বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর জ্বলিতেছে পুড়িতেছে পোড়াইতেছে, এই জ্বলাতেই বিশ্ব-পতির ভোগ ও ত্যাগ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি। এই আগুন কত ভাবে ভোগ করিতে জানে, কত ভাবে ভোগ করিয়া নিঃশেষ করে ও ভোগের পর ধোঁয়াতে পরিণত করে, তাহা কে বলিতে

পারে? সেমেলি Semele যেমন দেবতেজে ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছিল, বিশ্ববধূও সেইরূপ বিশ্বপতি বৈশ্বানরের তেজে ভস্মসাৎ হয়। ইহাই বিশ্বপতির ভোগ, বিশ্বপতির ত্যাগ। ইহাই বৈশ্বানরের ইন্ধন লইয়া খেলা। ইহাই বৈশ্বানরের খেয়াল।

শুধু ইন্ধন ভস্মসাৎ হয় না, আগুনও নির্ব্বাপিত হয়। আগুন যখন জ্বলিয়া উঠে তখন সে ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে, কিন্তু জ্বলিতে জ্বলিতে যখন ইন্ধনটি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন আগুনও নিবিয়া যায়, ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর সেই ধোঁয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। সব আগুনের পরিণাম এই ধোঁয়া। তবে ছোট আগুন ও বড় আগুন, সে কেবল ইন্ধন ভেদে। যে যত বড় জিনিষকে বেড়িয়া জ্বলে, সে তত বড় আগুন। একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিলে সেও একটি আগুন হইয়া উঠে, এবং সেই কাঠিটি নিঃশেষিত হইলে সেখানে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আবার যে আগুন একটি গ্রাম ব্যাপিয়া জ্বলে তাহার চরমেও সেই ধোঁয়া—আর সব ধোঁয়াই এক। কিন্তু এই যে জ্বলন, ইহাও কি সর্ব্বত্র এক?

আগুন জ্বলে পুড়ে ধোঁয়া হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র একেবারে নিবিয়া যায় না। আগুন জঙ্গম, তাই সে এক আধারে নেবে কিন্তু নিবিবার আগে স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া যায়। তাই

সে বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে। ইহাই আগুনের খেয়াল, ইহাই আগুনের ফুল্‌কি।

আমার খেয়ালও তাহাই। আমি যে সেই বিশাল অগ্নিরই একটি রূপ! তাই আগুন যেমন কখনও নিবিয়া যায় না, আমিও নিবিতে পারি না। তাই আমি অন্তহীন। তাই আমি অমর অজর। বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিতেছি, ও নিত্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জ্বলিতে জ্বলিতে আমার চৈতন্যকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। বিশ্বাত্মার ভোগের শেষ নাই, তাই আমারও ভোগের শেষ নাই। বিশ্বানল যেমন এই বিশ্বগোলককে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে পুড়িতেছে ও অবশেষে তাহাকে ধোঁয়ায় পরিণত করিতেছে, এবং পুনরায় ধোঁয়ার ছায়া হইতে নূতন কায়া সৃজন করিয়া তাহাকে বেড়িয়া আবার ভোগ করিতেছে, আমিও তেমনি প্রতিবস্তুকে লইয়া কত ভাবে, কত রঙ্গে কত ভঙ্গে, ভোগ করি। এই জ্বলাই আমার ভোগের পথ।

আমার আগুনের যে আশ্রয়, সে আমার বিশ্ব, আমার গোলক। আমি সেই গোলকের অধিষ্ঠাত্রী। আমি এই গোলকটি অধিষ্ঠান করিয়া আমার প্রাণের আগুনে ইহার উপর কত ভিন্ন রঙ্‌এর ভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিতে থাকি। আমার খেয়াল—আগুনের খেলা—এই

গোলকটি লইয়াই, ইহার বর্ণভঙ্গিমায়, ইহার রূপ-পরিবর্ত্তনে।

চাঁদের যেমন তিনটি রূপ, আমার গোলকেরও তাহাই। সূর্য্যের আলোক যখন যে ভাবে চাঁদের উপর পতিত হয়, চাঁদও আকাশে সেই ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে—কখনও পূর্ব্বমুখী কলায়, কখনও পূর্ণিমায়, কখনও পশ্চিমমুখী কলায়। আমার প্রাণের আগুনেরও তিনটি রূপ—গোম্‌রান, জ্বলা ও নেবা, আর এই তিন আগুনে আমার বিশ্বগো[illegible]কও একে একে তিনটি রূপে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। আমি বিশ্ববস্তুকে তিন ভাবে ভোগ করি—আমার [illegible]র্ত্তিতে ভোগ। তাই এই বিশ্বগোলকের অধিষ্ঠাত্রীও ত্রিমূ[illegible]

আমার আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে কোথায় [illegible]ব-স্থান করে? সে কোন্ ইন্ধনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কণায় [illegible]য়, প্রবেশ করিয়া গুমরাইতে থাকে? জানি না এমনই করিয়া কত দেশকাল যুগযুগান্তর ছায়ার মত ভাসিয়া গিয়াছিল। কোন্ নেবুলার রাজ্য হইতে আমার সেই বাষ্পীয় গোলক কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অবশেষে আমার গোলাধার হইয়া দাঁড়াইল! অকস্মাৎ দেখিলাম একটি গুহাস্থিত অগ্নিকুণ্ডের অন্তরে নিভৃতে আগুন গুমরাই-তেছে, আর সেই চিরসঞ্চিত তিমির যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায়

অনাবৃত হইতে লাগিল। প্রাণের আগুন গুমরাইয়া গুমরা-ইয়া জ্বলিয়া উঠিলেও, ঘুম ভাঙ্গো ভাঙ্গো হইয়াও যেন ভাঙ্গিল না। সেই আধ আলো আধ আঁধারে, আধ ঘুম ঘোর আধ জাগরণে, দেখিলাম এক দিব্যমূর্ত্তি, আমার গোলকের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা, শ্বেতপদ্মাসনা, বিবসনা। সেই যাদুকরী প্রতিমা যেন আমায় যাদু করিয়া লইল। তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, উষার প্রথম আলোকে আমার গোলকটি দেখিয়া লইলাম। সে যেন এক ছবির রাজ্য—একখানি প্রকৃতি-পট। সে পট শুধু কালিমার আঁচড়ে অঙ্কিত নহে, নানা বর্ণের সংমিশ্রণেই অঙ্কিত, কিন্তু সপ্ত রঙ্ এখানে মিলাইয়া একটা উজ্জ্বল-রসশ্রী আধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গে—তাহার বর্ণে রসে গন্ধে গীতে, যেন বিশ্ব আগুন গুমরাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রজ্বলিত হইয়া সেই সপ্ত জিহ্বার সপ্ত রঙ্ পৃথক করিতে পারে নাই। সূর্য্যের কিরণ এই স্ফটিক গোলকে প্রতিফলিত না হইলে রঙ্ ফুটিবে কেমনে? এখনও যে কুয়াশার আবরণ, উষার ক্ষীণালোকে অস্ফুট লাবণ্যছায়ার তরঙ্গহিল্লোল, আকাশে মেঘমালা কোথাও কুণ্ডলাকৃতি, কোথাও বলয়িত, কোথাও ফেনপুঞ্জনিভ। সে গোলকে সকল প্রাণ, সকল পদার্থই, মোহাবেশে অভিভূত। সে যেন এক মায়াপুরী, পরীর রাজ্য। কোথাও

Fairies dance in fairy rings
In an elfish light on the emerald green!

কোথাও আরব্য-উপন্যাসের সেই অরুণ আলোকে মায়াবিনীর উদ্যান, সেই স্বর্ণালোকমণ্ডিত শুভ্র অট্টালিকা যেথায় কত প্রণয়ীর শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর মূর্ত্তি যাদুমন্ত্রে সংজ্ঞাহীন, কাহারও বা স্ফটিক মীনপাত্রে স্বর্ণমীনমূর্ত্তি, আর সবাই যাদু হইতে মুক্ত হইবার মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আবার কোথাও সেই উপকথার রাক্ষসপুরীতে কোন্ এক সূর্য্যাস্তের দেশে সপ্তমহল অট্টালিকার অন্তঃপুরে ফেন-শুভ্র-শয্যাশায়িতা সেই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা, সেই Sleeping Beauty, ও তাহার শয্যাপার্শ্বে সেই সোণার কাঠি রুপার কাঠি, সেই ঘুম ভাঙ্গাবার magic wand, পড়িয়া আছে, কিন্তু যুবরাজ এখনও আসে নাই তাই রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গে নাই। আবার অন্যদিকে দেখিলাম রম্য দেব[illegible]। কন্দরে কন্দরে মুগ্ধা বনদেবতার বিহার। দেখিলাম কোথাও নির্ম্মল প্রস্রবণে (Naiad) নাইয়াডের অবগাহন, কোথাও *(Nymphs) নিম্ফ্স্‌দের জলক্রীড়া, কোথাও বা (Fauns, Satyrs) ফন্‌স্‌দের দ্রাক্ষারসপান ও নৃত্য।* উপরে চাহিয়া দেখি রৌপ্যচাপহস্তা ডায়ানা (Diana) মুচকি হাসিয়া বঙ্কিম-গ্রীবায় আকাশ-হরিণকে অনুধাবন করিতেছেন, আর নীচে

আকাশতলে ধনধান্যভরা বসুন্ধরার প্রতিমূর্ত্তি ডিমীটার (Demeter) মাথায় এক আঁটি পাকা ধানের শীষ বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন!

এখানে নিত্য দো-আলো। এ দো-আলোয় ছায়া ও কায়ায় কোন ভেদ নাই। এখানকার চাঁদে চাঁদিনী আছে, কিন্তু প্রণয়ীপ্রণয়িণীর চোখ আজও অর্দ্ধনিমীলিত। এ সাগরেও তরণী ভাসমান কিন্তু মাঝি নাই, বসুন্ধরার গর্ভে আছে রত্ন কিন্তু মণিমালা দিয়া বিশ্বপতিকে বরণ করিয়া লইবে কে? বান ডাকিবার আগে যেমন গঙ্গাবক্ষ ফুলিয়া উঠে এখানে নরনারীর প্রেমও তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে ফোঁপাইয়া উঠে, কিন্তু বন্যার ন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া তটভূমি প্লাবিত করিয়া আজিও হুহুস্বরে বহিতে শিখে নাই। আর বাঁধ ভাঙ্গে নাই বলিয়া সে প্রেমে বিকার নাই, মায়া-বন্ধনও নাই। এ প্রণয়ে মান অভিমান, আশা নিরাশা, মিলন ও সংগ্রাম নাই। যেমন সংগ্রামের পূর্ব্বে কোন সম্রাট নিজ সাম্রাজ্যের সৈন্য ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে *প্রস্তুত করিতে থাকেন, ইহাও ঠিক জীবনসংগ্রামের পূর্ব্বাবস্থা।*

ইহাই আমার ছবির রাজ্য। কিন্তু এ ছবি ও আমার নয়ন যেন এক ফ্রেমে আঁটা। যত মূর্ত্তি, যত ছবি, যেন

দেখিয়াও দেখি না। নয়ন চায় যত মূর্ত্তকে, যত সুন্দরকে, তাহার ফাঁদে বন্দী করিতে, কিন্তু কই কেহত ধরা দেয় না! *বাঁধিতে চাই বাঁধা মানে না। আমি যেন সেই ছবি দেখিতে দেখিতে ছবির সঙ্গে প্রকৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া যাই,* সেই ছবির রঙ্‌এ প্রাণের রঙ্‌ বিসর্জ্জন দিয়া যেন রঙ্‌হীন হইয়া থাকি। এই ছবির সঙ্গে ছবি হওয়া আমার প্রথম ভোগ। ইহাই বিশ্বগোলকের আদিমূর্ত্তি।

দেখিতে দেখিতে আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল, অকস্মাৎ দেখিলাম সেই অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনটিকে বেড়িয়া আগুন দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে। অমনি সেই আমার শান্তসুন্দর বিশ্বছবি যেন মুছিয়া গেল, সেই অস্ফুট ফিকেঁ রঙ রক্তিম আভায় ঘোর হইয়া উঠিল, আর বৈশ্বানর যেন রণে মাতিয়া দিঙ্‌মণ্ডল দগ্ধ করিবার জন্য লোল-জিহ্বায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক রণ-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম আকাশের রক্তিম চক্ষে, ধরণীর নিঠুর বক্ষে, জীবনসংগ্রামের অভিনয় জাগিয়া উঠিয়াছে, আর দেখিলাম সেই বিশ্বমঞ্চের অভিনেত্রী, রমণীর দিগম্বরীমূর্ত্তি, লোলকটাক্ষা, রক্ত-পদ্মাসনা। সেই অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি-শিখা সেই মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুনের উত্তাপে প্রাণী-

মাত্র মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াছে। যেন চিত্রপট হইতে শিল্পীর প্রাণ বাহির হইয়া আসিল। আর সে চিত্রের মধ্যে আপনাকে মগ্ন রাখিতে রাজী নয়। প্রাণ আজ প্রকৃতি-দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ক্ষান্ত নহে, আজ সে নিজে দর্পণ হইয়া সকল রঙ্, সকল বিম্ব, সকল ছায়া, আপন অঙ্গে প্রতিফলিত দেখিতে চায়। সেই কুয়াশার প্রহেলিকাময় আবরণ আর নাই। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি আমার স্ফটিক গোলকে এখন প্রতিফলিত। প্রকৃতিরূপসী আজ বর্ণে রসে গন্ধে গীতে সমুজ্জ্বলা, সুতীব্রা, মুখরা, উন্মাদনী। কিন্তু এই উজ্জ্বলরসশ্রীতে শান্তি নাই, এ যেন বহ্নির সহস্র জিহ্বা লেলিহ্যমানা। ইহাই বাসনার রূপ, রূপের বাসনা— ইহাই ভোগাগ্নি।

সৈকতে দাঁড়াইয়া শুনিলাম সাগর অনন্তপিপাসা প্রাণে লইয়া পৃথ্বীর যত নদনদীকে আপন বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কেবলই গর্জ্জন করিতেছে। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম নীচে ধরণীমাতা বহুসন্তানবতী জননীর ন্যায় সহস্র স্তন হইতে সহস্র ধারায় আপন সন্তানদিগকে পীযূষ পান করাইবার নিমিত্ত ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছেন। আর দেখিলাম, উপরে মহাকাশ সকল ক্ষুদ্র আকাশকে, সকল খণ্ডশূন্যকে, মহাশূন্যে বেষ্টন করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান

করিয়া আছে। চোখ বুজিয়া দেখি, অনাত্তনন্ত মহাকাল সকল ক্ষণ পল দণ্ডকে আপন অ-কালে গাঁথিয়া লইবার নিমিত্ত শেষ মুহূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন! বুঝিলাম এ বিশ্বে সর্ব্বত্র এক জন অপরকে গ্রাস করিতে চায়, কিন্তু অপরে সেই করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য সতত পরিধির বাহিরে ছটকাইয়া পড়িতেছে! তাই সাগরে প্রবিষ্ট হইলেও যত নদনদী, যত প্রস্রবণ, আবার বাষ্প আকারে বাহির হইয়া আসে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-পলগুলি সেই মহা-অকালের গ্রাস হইতে নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া পলাইতে পলাইতে কাল ও অ-কালের গণ্ডীর সীমানা সৃজন করিতেছে। এ গোলকের এই নিয়ম। একবার এক হইতে বহুর দিকে, আবার বহু হইতে একের দিকে, আকর্ষণ বিকর্ষণ। একবার বিসর্গ একবার সংসর্গ। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জলিতেছে—একটি প্রবাহের টানে সকল পদার্থ কুণ্ডমুখে প্রবেশ করিতেছে, আর একটির উজানটানে কুণ্ডমুখ হইতে বাহির হইতেছে।

এ গোলক এক নিত্য-মধ্যাহ্নের দেশ। আর সকল প্রাণই সেই মহান্ বিজয়ী সূর্য্যের এক একটি স্ফুলিঙ্গ,—ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। এখানে স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে রেষারেষি। ইহারা একজন আগুন একজন ইন্ধন নহে, পরস্পরেই

পরস্পরের আগুন, তাই আগুনে আগুনে এই রেষা-রেষি কে তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারে। কই পারিল কি ?

কিন্তু ভোগাগ্নির চরমে কি শান্তি নাই ? আছে আছে, এ মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আছে,—আলো ও ছায়ার খেলা, এ নিদাঘের পর শরৎ আছে—রোদ ও মেঘের মেলা। রেষারেষির পর মেশামিশি। নবীনে নবীনে রেষারেষি, নবীনে প্রবীণে মেশামিশি! আগুন সে প্রবীণ, ইন্ধন সে নবীন !

আগুন যে চিরপুরাতন। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া আগুন জ্বলিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির নির্ণয় করিবে কে ? আর ইন্ধন, তার যেন নিত্য নূতন রূপ, নিত্য নূতন বেশ। আগুন যে ইন্ধনকে চায়, সে প্রবীণের নবীনকে চাওয়া। ইন্ধন যে আগুনকে চায়, সে নবীনের প্রবীণকে চাওয়া। এই যে নবীনে প্রবীণে খেলা ইহাই মানব-জীবন। প্রবীণের প্রবীণতা হইল জগতের যত ইতিহাস, যত কাহিনী, যত জ্ঞানের সঞ্চয়ে; আর এই প্রবীণতায় তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াই নবীনা অক্ষয়-যৌবনা (Eos) ঈয়সের তৃষা মিটাইতে পারিবে জানিয়া(Tithonus)টিথোনসের আত্মা অমর প্রবীণতা মাগিয়া লয়, চিরনবীনতা মাগে নাই ! (Eos) ঈয়সের বরদান, সে

যে নবীনের প্রবীণ-প্রাপ্তির আশীষ! এই নবীনের সহিত *কারবারেই প্রবীণের পুনর্জ্জন্ম, অক্ষয়বৃদ্ধি, চিরন্তন স্থিতি। নবীনই প্রবীণের প্রাণ, তাহার ভোগের সহায়, ক্ষুধার নিবৃত্তি।* নবীনের নবীনতা সে যে সদ্যোজাত পুষ্পের আসব, কিন্তু তাহা কি প্রাচীন বৃক্ষমূল হইতে রস টানিয়া ক্ষরিত হয় নাই? তাই নবীনের প্রাণ হইল প্রাচীনকে নিয়তই লুণ্ঠন করায়, খণ্ডে খণ্ডে অংশে অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবীণকে আপন নবীন শরীরে গাঁথিয়া লওয়ায়, আপনার নবীন রসে প্রবী-ণকে নবজীবনে লাভ করায়। তাই বসন্তের পুষ্প প্রাচীন বৃক্ষে নবীন মূর্ত্তির বিকাশ, তাই কত যুগের কঠিন শিলায় শৈবালের জন্ম, তাই স্তব্ধগম্ভীর হিমাদ্রিকণ্ঠে প্রস্রবণের কলকলধ্বনি, তাই অগাধ চিরন্তন সাগরবক্ষে ফেনমাল্য! এ সকলই নবীন মূর্ত্তিতে প্রাচীনের পরিচয়।

বুঝিলাম এ জগতে নারীমূর্ত্তিই চিরপ্রবীণা, তাই আজন্মকাল পুরুষ খণ্ডে খণ্ডে নারীশরীর বিলুণ্ঠন করিয়া, নারীর রক্ত শোষণ করিয়া, জগতে খণ্ডরসের সৃষ্টি করি-তেছে। নবীনের প্রাণ এই খণ্ডরসে। তাই প্রতি প্রাণী প্রতি বস্তুই নবীন, কেবল বসুন্ধরার মাতৃমূর্ত্তি যেন চির-প্রবীণা। তাঁহার দেহে যত ইতিহাসের, যত সভ্যতার, যত সাহিত্যের, যত জ্ঞানের, পলি পড়িয়া আছে।

আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল, অকস্মাৎ অগ্নি-কুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি ইন্ধনটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন আমার বিশ্ব-গোলকের সেই রক্তিম আভা মিলাইয়া গিয়া যেন এক ধূসর আলো ছড়াইয়া পড়িল। আর সেই আলোকে দেখিলাম বিশ্ব-নারীর চির-প্রবীণা মূর্ত্তি, নীলাম্বরী, নীল-পদ্মাসনা। নীলাকাশের মত এই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্ব-গোলককে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ভূপৃষ্ঠে দেখিলাম যেন জলপ্লাবনের পর তট-ভূমিতে যুগান্তের পলি পড়িয়া গিয়াছে। সেই পলির উপর গাছের যত পাতা বিবর্ণ হইয়া নিরন্তর ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। যত পক্ক শুষ্ক ফল হইতে বীজ বাতাসে উড়িয়া মৃত্তিকা গর্ভে আশ্রয় লইতেছে, আর বাদলা হাওয়ায় যত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর দেশের নীড় ছাড়িয়া দক্ষিণা-কাশ অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে সেই ধূসর আলো ধূম্র হইতে ধূম্রতর হইতে লাগিল। দেখিলাম ছাইএর স্তূপ মাটিতে পড়িয়া, আর ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া শূন্যে মিলাইতেছে। বুঝিলাম ঐ যে বসুন্ধরার পলি, তাহা ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কত যুগযুগান্তের—জন্ম জন্মান্তরের আগুনের সেই ভস্মে পরিণতি। যত অতীতের অভ্যাস, যত পূর্ব্বস্মৃতি, যত খেয়াল, যত সংস্কার পুড়িয়া

জ্বলিয়া ছাই হইয়া বিশ্বে এই ভস্মের পলি সৃষ্টি করিয়াছে। এক দিকে এই প্রাচীন পলি যাহাতে সৃষ্টির বীজ নিহিত, অপরদিকে ধোঁয়া, ভোগের শেষে জ্ঞান, যাহা চিরন্তন আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই আগুনের ভোগের পথ। এই ছাই ও ধোঁয়া এক আগুনেরই দুই দিকে পরিণতি। একটি matter অপরটি spirit, একটি জড় অপরটি চিৎ, একটি স্বভাব অপরটি পরভাব, একটি রাগ অপরটি জ্ঞান। ছাই হইল ধোঁয়ার কায়া, মূর্ত্ত-প্রকাশ, খণ্ড-প্রকাশ, আর ধোঁয়া হইল ছাইএর মুক্তাত্মা, যাহা চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেছে। ভোগে শেষে, যত হৃদয়ের ধক্‌ধকানি, যত পরাণের জ্বলনিপোড়নি ক্ষান্ত হয়, যত যুক্তিবিচারসংশয়ের মীমাংসা হইয় যায়, তখন আসে শান্তি, আসে মুক্তি, আসে জ্ঞান তখ প্রাণের আগুন নিবিয়া ধোঁয়া হয়, আর [illegible]ার রাশ মহাকাশে মিলাইয়া যায়। অনাদি কাল হইতেই বিশ্বে জ্বলিয়া পুড়িয়া মহাকাশকে এই ধোঁয়ায় আবৃত কর্‌ তেছে। দিনে দিনে যত ভোগান্তে অভিজ্ঞতা, য বন্ধনান্তে মুক্তজ্ঞান, যত পাপবিদ্ধের অন্তিমে শুদ্ধিবো যত ভ্রান্তের অন্তিমে সত্য আদর্শ, ভোগাগ্নির নির্ব্বা নিরন্তর আকাশ পানে উঠিতেছে, আর বিশ্বাদর্শের আকা

সঞ্চিত হইয়া সেই আদর্শকে পূর্ণ করিতেছে, অজর অমর অক্ষর করিয়া রাখিয়াছে। তাই যজ্ঞাহুতি পুড়িয়া যে ধোঁয়া হয়, তাহাই দেবতার খাদ্য। তাই বৈদিক ঋষির হোমানলে যত ভোগের আহুতি। এই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত না করিলে দেবগণের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত কেমনে? ধোঁয়া না হইলে আকাশে স্থান কোথায়!

এই যে শেষের ভোগ, ভোগের শেষ, ইহা ত দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ হয় না। শুধু আগুন ও ইন্ধনের সমাবেশে চলে না। এখানে তিনের সংস্থান আছে। মাটিতে ছাই এক দিকে, শূন্য আকাশ অপরদিকে, আর এই সূক্ষ্ম ইন্ধনাগ্নি, এই ধোঁয়া, মাঝখানে। এই ধোঁয়াতেই মাটিও আকাশের আদানপ্রদান। ইহাই জড় ও চিৎ এর, ভোগ ও জ্ঞানের, বাস্তব ও আদর্শের, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের, সন্ধিক্রম। তাই বলি ধোঁয়াই মধ্যবর্ত্তী।

মধ্য-পর্ব
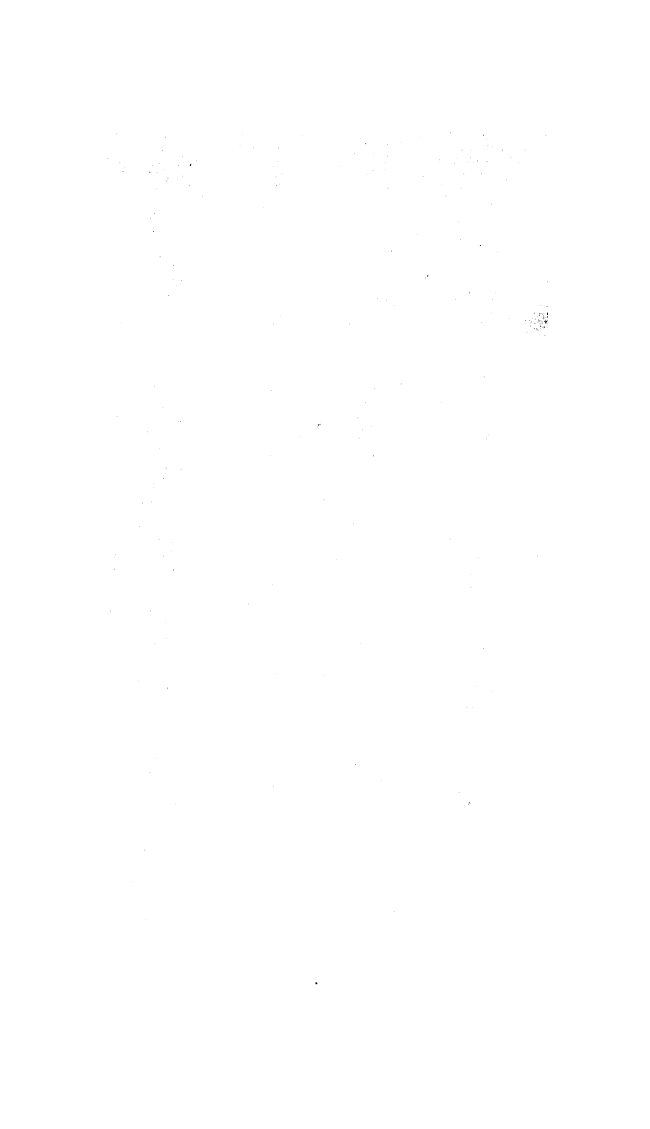
মধ্য-পথে

১—ফাঁকা

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

চলাই আমার ধর্ম্ম। তাই ক্রমাগত চলিতেইছি। নদীর স্রোত যেমন বহিয়া যায়, শূন্যে বায়ু যেমন অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, সময় যেমন আর ফুরায় না, তেমনি আমারও আর চলার শেষ হয় না। কিন্তু ইহারা অবিরাম একভাবেই চলিয়া যায়; আমি তাহা পারি না। আমি চলিতে চলিতে এক একবার থামিয়া লই। কাব্যের ছন্দে ছন্দে যেমন যতি, রাগিণীর তালের পর সম, হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে একটি বিরাম, আমার গতিতেও তেমনি এক একটি অবকাশ। তাই আমি থেকে থেকে থেমে থেমে চলি। নহিলে আমার তাল কাটিয়া যায়।

কিন্তু কবিতাটির ঝঙ্কার আস্বাদ করিতে যেমন তাহার স্বরবিন্যাস ও যতিগুলিকে ছন্দের সুরে গাঁথিয়া লই, গানের সুরটি আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন তাহার স্বরপরম্পরার এককালীন মানস অনুভূতি আবশ্যক, সেইরূপ জীবনটিকে

পূর্ণ করিয়া পাইতে হইলে তাহার গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া বুঝিতে হয়। তাই আজ আমার জীবনের গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে বসিয়াছি। এই গতি ও অবকাশ উভয়ই যে আমার জীবনের অঙ্গস্বরূপ।

যখন হইতে চলিতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই একটু জ্ঞানের আভাস আসিয়াছে। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই আমার একটা মস্ত অবসর ছিল। এবং সেই অবসর ছিল মাটির মত অসাড়, আকাশের মত অবাধ, অনন্তকালের মত স্থির। আর সেই নিবিড় তলহীন অসাড়তার অতলে, সেই চির আঁধারে, আগুন যেমন চকমকির ঘর্ষণের অপেক্ষায় অথবা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিলা যেমন সূর্য্যোদয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে, আমার প্রাণশক্তিও সেইরূপ নিয়তির ভবিষ্যবাণীর প্রতীক্ষায় নিঃসাড়ে অকালনিদ্রায় মগ্ন ছিল। কিন্তু *একদিন সেই অকাল-নিদ্রার অবসানে চৈতন্য কালজ্ঞানরূপে ভাসমান হইল, তথাপি জড়তার খনিতে যাহার উৎপত্তি তাহার জড়তা দূর হইল না। সে আপনাকে কিছুকাল* সর্ব্বকর্ম্মের অতীতে রাখিয়া শুধু মূক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিল। কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন বিনা কাজে বৃত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন, সেও সেদিন একপার্শ্বে বসিয়া বিশ্বের কৌতুকময় বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

কে বলিবে কেমনে সেই চিরপুরাতন জড়তায় শক্তির আবেশ আসিল। দেখিতে দেখিতে দূর হইতে এক কল্লোলময় প্রবাহ আসিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই শূন্য জড়রাজ্যকে যেন এক উদ্বেলিত কারণসাগর করিয়া তুলিল। সেই কত যুগের অলীক স্বপ্ন, সেই অঘোর ঘুম-ঘোর, তমসার আবেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল। এবং সেই কারণসাগর হইতেই 'আমি'র উদয় হইল। কে যে আমাকে "আমি আছি" বলিতে শিখাইল জানি না, কিন্তু সেদিন আমি স্বেচ্ছায় সজোরে বলিয়া উঠিলাম "আমি আছি"।

তখন দেখি আমারও সে প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া চলিবার শক্তি আছে। আমি এখন চলিতে আরম্ভ করিলাম। এবং আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও আকাশের বিভাগ হইল, মাটিতে নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইল, আকাশ সূর্য্য-চন্দ্রনক্ষত্ররাশিকে বুকে করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল, আর সময় খরচের হিসাব না রাখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-বহির্ভূত নবীন প্রস্রবণের ন্যায় আমিও আমার স্বচ্ছ প্রাণটির সহিত নানা ছলে নানা কৌশলে খেলিতে খেলিতে ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে কত বনদেবতার রম্য বিহারভূমি, কত উপকথার তেপান্তরের মাঠ ও চাঁদা-

মামার দেশ, কত আরব্য উপন্যাসের অরুণালোকদীপ্ত মায়াপুরী পার হইয়া অবশেষে এক চিরবসন্তের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। হায় সে চিরবসন্ত! আমার উজ্জ্বল-মধুর কান্ত! কোন্ ভ্রান্তির ছলনায়

ঘুমঘোর এল কেন আমার এ চক্ষে,
স্বপনেতে ভেসে গেলে আঁধারে অলক্ষ্যে!

নদীর স্রোত বহিতে বহিতে সাগর-সঙ্গমে প্রাণ হারাইয়া ফেলে; আমি কিন্তু লীলা করিতে করিতে সেদিন, বসন্ত-বিরহে ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায়, ব্রজের বনভূমিতেই ঠেকিয়া গেলাম। সেদিন আমার সকল শক্তি—যাহা সেই শক্তি-প্রদায়িনী ধারা হইতে অর্জ্জন করিয়াছিলাম—তাহা সব নিঃশেষ হইয়া গেল। জলাভূমিতে মরাগাঙ্গের ন্যায় আমি সেই মধ্যপথে প্রাণ হারাইলাম। আমার চলা বন্ধ হইলে, সেদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল পার্থিব বস্তুরই গতিরোধ হইল। আকাশেরও ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। এই হইল আমার গতিতে প্রথম বিরাম, জীবনে প্রথম অবকাশ, প্রথম শূন্যতা।

আমি থামিয়া রহিলাম। বীজটি রোপণ করিবার পর অঙ্কুর হইয়া দেখা দিবার আগে কিছুদিন মাটিতে থামিয়াই থাকে। ধান পাকিলে কাজে লাগিবার আগে অন্ততঃ

কয়েক মাস কৃষকের গোলা ভরিয়াই থাকে। বাষ্প পুনরায় বারিধারা হইয়া বর্ষিত হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আকাশে অদৃশ্য হয়। আর ঐ যে অবিরাম নদীস্রোত, আবর্ত্তী বায়ুপ্রবাহ, অফুরন্ত সময়ক্রম, উহারাও একদিন না এক-দিন নূতন সৃষ্টির বীজ আধান করিয়া স্থির হইয়া যায়। তাই, বিশ্বে চেতন অচেতন সকল পদার্থে, এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও, গতির পর বিরাম আসে। আর আমি যেমন সকল শক্তি খোয়াইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়াছিলাম, তাহাদেরও এক সময় আসে যখন হায়রাণ হইয়া তাহারা মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যায়। আর সেই কারণেই মাটির এমন সৃজনী শক্তি, সে যে সকল শক্তির আশ্রয়স্বরূপ, লয়ভূমি।

আমার সেই শক্তি-প্রদায়িনী প্রবাহিণী, সে কোন শূন্যে থাকে ? সেই শূন্যে, সেই কারণ-সাগরে, না ডুবিলে শক্তি সঞ্চয় করিব কেমনে ? এ জগতে সবাই যেখান হইতে আসে সেখানেই ফিরিয়া যায়। সেই স্থানটি মূলাধার। তাহাই বিরামভূমি। তাই বিরামের পর সকল বস্তুই প্রাণ-ময় হইয়া উঠে। তাই কাব্যের ছন্দে ছন্দে যতিই প্রাণ, তাই রাগিণীর তালের মাঝে মাঝে সমই সঙ্গীতজ্ঞের মাতন। আমার গতিতেও সেইরূপ অবকাশই শক্তি, অবকাশই মুক্তি।

কিন্তু এই বিরামের ক্রোড়ে কোথায় থাকি, কি ভাবে অবস্থান করি, তাহা আমার অনির্ব্বচনীয়। যেন পাখীর ডিমের ভিতর থাকা। অথবা যেমন চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে চিত্রকরের কল্পনায় সেই চিত্রের চাক্ষুষ আভাস ভাসে ভাসে—ভাসে না, রচনাটি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে লেখকের কাণে তাহার সুরটি বাজে বাজে—বাজে না। আমার অবকাশগুলিও ঠিক সেইরূপ। যেন শক্তির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে। সেই অবসর হইতেই আজ আমি পুনরায় চলিবার শক্তি পাইয়াছি।

"চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্"।

অবসর কাটিয়া গেল। বসন্ত-প্রয়াণের আরম্ভ হইল। আমি যেন শূন্যের মাঝ হইতে ভাসিয়া উঠিলাম। আমি কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমেই আকাশের পর আকাশ পার হইয়া ভাসিয়া যাইতেছি।

অনাদি কাল হইতে এই শূন্যের মাঝে পথ কাটিয়া কাটিয়া, কোথায়, কোন আদর্শের কল্পনা লইয়া চলিতেছি! শুধু আমি নয়; আমার বিশ্বগোলকও আমাকে যুগে যুগে অনুধাবন করিতেছে। কিন্তু কই আদর্শের রহস্য ঘুচিল কই? দিনে দিনে ত আদর্শ বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান

যতই বাড়িতেছে, আদর্শের রহস্য ততই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে।

যেমন দ্রষ্টা কোনও স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে যতদূর দেখে তাহাই তাহার দিঙ্‌মণ্ডল। সে যদি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়ায়, তবে তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের আয়তন পূর্ব্বের তুলনায় প্রসারিত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দেখে, পৃথিবীকে ছাড়াইয়া যায় না। তাই সে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এখন যাহা দেখিতেছে তাহার অন্তর্গত হইয়া আছে। তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের সীমানা বৃহত্তর হইলেও, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বৃত্তের সহিত সমতল বা সমান্তরাল। আমার কিন্তু তাহা নয়। যদিও আমার আকাশ দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে, তবু আমি যাহা পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম এখন আর তাহা দেখি না ;—আমার দিঙ্‌মণ্ডলও আমার সহিত ক্রমেই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে উঠিতেছে। ধরাতল আমার পদতল হইতে খসিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপ যন্ত্রের পরতগুলি যেমন এক একটি করিয়া চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ কত বিচিত্র দৃশ্যাবলী ভাসিয়া গেল, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্যানী, কত নদী, কত হ্রদ, কত উপত্যকা, কত অধিত্যকা, কত শিখরের পর শিখর, বায়ুমণ্ডলের পর বায়ুমণ্ডল, কত গোলকের পর

গোলক, আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। কত সৌর-জগতের পর সৌরজগৎ, কত তারকামণ্ডলের পর তারকা-মণ্ডল, একে একে পার হইয়া কোথায় উঠিতেছি। কত লোকের পর লোক, স্বর্গলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক সেই সপ্তলোক অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কত আলোক আঁধার, আঁধার আলোক, কত রং বেরং, সেই কৃষ্ণ লোহিত শুক্ল, সেই শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ, সেই লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল, কতবার কতভাবে মিলাইয়া যাইতে যাইতে যেন আজ সব সাদা ফাঁকা হইয়া আসিতেছে।

এই ব্যোমমার্গই কি সত্যাদর্শের পথ? বসন্ত-প্রয়াণে আমি আজ সেই পথেরই পথিক, কিন্তু কই এ পথ ত চলিয়া শেষ করি[illegible] পারি না! যতই উঠি না কেন, সে নিত্যধাম [illegible]কটে আসে না। বালক যেমন মাঠে দাঁড়াইয়া অদূরে মাটি ও আকা[illegible]র সীমানা দেখিয়া তাহার দিকে ছুটিতে থাকে, আমিও তেম[illegible]নি যে আদর্শের পিছে ছুটিয়া আসিলাম, আজ বুঝিতেছি সে[illegible] স্থানে পৌছিবার শক্তি আমার নাই। সে আদর্শ আমার [illegible]জ্ঞানে একটি পরপারের রহস্য হইয়াই থাকিবে। সে যে পর[illegible]ব্যাম, অনাদি, অনন্ত, ভূমা, তুরীয়, আমার সকল শক্তি সকল[illegible] জ্ঞানের অতীতে। তাহাকে ত সীমানার মধ্যে আনা যায় [illegible]না, তাই সে যেমন তেমনি রহিল,

মাঝ থেকে পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠধামের ব্যবধান৷ নিজের
গেল। পৃথিবী পাতাল হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। ত আর
বৈকুণ্ঠধাম মাঝের আকাশ ছাড়িয়া উর্দ্ধাৎ শূন্য
উঠিয়া গেল! মাগত

আমি নীচে ঐ পাতালে আঁধারেই ছিলাম। ড়িয়া
ছিলাম বৈকুণ্ঠধাম নাকি আলোকময়, তাই পাতাল
পাতাল ও বৈকুণ্ঠধামের মাঝখানে মর্ত্ত্যে একটুখানি র্ত্ত্যে।
দখল করিলাম। উপরের অজ্ঞেয় রহস্য ও নীচে
কথা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখময়ের সেবায় কাল কা
কিন্তু সে মর্ত্ত্যের টান ছাড়া হইয়া আজ যেখানে । যেন
সেখান হইতে কিছুই দেখিতে পাই না। "আয় পথ
আলোকের" আশায় এত পথ চলিয়া আসিলাম,
আলোক ত পাইলাম না, এ যে আঁধার হ'য়ে এ
দেখিতেছি যত আলোকের মেলা, যত রংএর ছটা বিক
পথেই। মাঝপথ ছাড়িলে সব আঁধার। পথে

বসন্ত-প্রয়াণে আমি সেই মাঝপথ ছাড়িয়া হউক,
তাই আমার বিশ্বছবি মুছিয়া গেল। সেই হরিদ্বক যাত্রা
সেই নীলাকাশ, সেই শুভ্রফেন অতল জলধি, ক্ষণেরও
শূন্যসাগরে মিলাইয়া গেল। আমার বর্ত্তমান ও নূতন
অতীতের নিশায় মিলাইয়া যাইতেছে। ভবি ইতিবৃত্ত

গোলক, অত্যক্ষ-জীবন বর্ত্তমান হইয়া উঠিবে ভাবিয়াছিলাম, জগতের ান দেখিতেছি বর্ত্তমান শেষে অতীতেই মিলায়। মণ্ডল, ই জগতের নিয়ম। বীজ হইতে ফলের সৃষ্টি, কিন্তু লোকের রিণতি পুনরায় সেই বীজে। ভাব হইতে ভাষা, সপ্তলোকাষার উদ্দেশ্য পূর্ব্বজ ভাবকে জাগাইয়া তোলা। আঁধার, হইতে রূপের বিলাস, কিন্তু রূপের লয় সেই লোহিত অরূপেই। ইহাই বিলোমগতি। এই বিলোম পথ শুক্ল, কত করিয়াই দেহী প্রাণ একদিন বিদেহ প্রাণময়ের সব স্যাদা পস্থিত হয়।

এই ত এই পথেই আসিলাম। এখন দেখি যে আমি আজ রাজ্য ফাঁকা। আমি সেই ফাঁকা রাজ্যেই শেষ করি সবরি আলোক আঁধার মিশাইয়া গিয়াছে। মাটি ও ায়ার লো শ মাত্র নাই, যেন উপর হইতে নিরাবরণ থাকে, আ মিয়া আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিল। এই আজ বুঝি শেষ? চক্ষু বুজিয়া আসিল, হাত পা অবশ সে আদর্শ াতেছে, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। সেই থাকিবে। "আমি আছি" বলিয়া স্বেচ্ছায় স্থানটি অধিকার আমার সকল স্থানে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কৈ? সীমানার মধে ণ বিকর্ষণের উপ্গারে আমার যে একটি নিজের আজ সে শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে;

আজ সে শক্তি অনাথা, এই টানাটানির ঝোঁকে নিজের টানটি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। আর পারি না, আর সামলাইতে পারিলাম না। এ কিসের করাল টানে শূন্য *অম্বরে উল্কার ন্যায় পড়িতেছি! পড়িতেছি, ক্রমাগত পড়িতেইছি। গেলাম গেলাম, বুঝি পাতালেই পড়িয়া গেলাম। কোথায় পড়িলাম কিছুই জানি না।*

চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমি যে মর্ত্ত্যে আমি সেই মর্ত্ত্যে। দিবালোকে আমি অস্বপ্নের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

কিন্তু কই এত পথ চলি স্বপ্নের ঝোঁক ত যায় না। যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিশিপাওয়া ব্যক্তির ন্যায় পথ চলিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

আমার চলায় জগৎও চলে। যেমন কোন নাবিক সাহসমাত্র সম্বল করিয়া আপন জাহাজে এক অজানা পথে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে—যে দিকেই হউক, কোন এক দিকে মুখ রাখিয়া বরাবর সোজাসুজি যাত্রা করে; এবং সে যদি চিহ্নিত উত্তরেরও উত্তরে বা দক্ষিণেরও দক্ষিণে, কোনও নূতন দ্বীপ বা সাগরপ্রণালী, কোনও নূতন উত্তম-আশাপথ আবিষ্কার করে,—তবে তাহার ইতিবৃত্ত

ভূগোল-ইতিহাসে সর্ব্ববাদী সত্য হইয়া চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকে ; এবং সেই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর মাটি ও জলের অংশও যেন কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ আজ সেই শূন্যসাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে দেশে আসিয়াছি, যে তত্ত্বভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাকে কি জগৎ তাহার তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান, বলিয়া গ্রহণ করিবে না ? আমার জ্ঞান, আমার ভগবান, কি আজ জগতের জ্ঞান, জগতের ভগবান, হইবে না ? আমার রহস্য কি জগতের রহস্য নয় ? আজ আমি যেখানে আসিয়া থামিয়া গেলাম— এই জগৎও কি সেখানে আসিয়া থামিয়া গেল না ? আমার বিরামে জগৎও কি বিশ্রাম লাভ করিল না ?

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

বসন্ত-প্রয়াণের পর এই বিরাম, ইহারও শেষ হইল। আবার চলিতে লাগিলাম। এবার নূতন পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। আজ সেই ব্যোমমার্গ, বিশ্বাতীতের পথ, ছাড়িয়া আসিয়াছি। মর্ত্ত্যের মহাযাত্রার সহিত তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিতেছি। তবে আর দিশাহারা হইবার ভয় নাই। সাম্‌নে একটি আলো, পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সেটি লক্ষ্যের প্রতিভাস। সেটি ভবিষ্যতের আভাস।

প্রত্যেক প্রাণীর চক্ষের অন্তরালে ভাসে এম্নি একটি

আভাস, এম্নি একটি স্বপ্ন। কবে যেন একখানা বিশ্বদর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই প্রত্যেক জীবে, সকল স্থাবর-জঙ্গমে, এক একটি খণ্ড আদর্শ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাই আজ ভুবনে আদর্শের প্রতিভাস নানা; নানা ভঙ্গিমায় নানা রঙ্গিমায় বিচ্ছুরিত। চরমে যে বস্তুর সহিত যাহার সঙ্গমলিপ্সা, যে যাহাকে ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়া তাহার কক্ষস্থিত গ্রহের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেই পরম বস্তুর আভাসই তাহার জীবনের আদর্শে প্রতিফলিত। সে আদর্শে ভালমন্দ বিচার নাই, সুন্দর কুৎসিতের বিচার নাই, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। সে যে সকল বিচারের উপরে। গ্রহ যেমন মন্দোচ্চ গতিতে তাহার নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে, আদর্শ-প্রতিভাসও সেইরূপ মর্ত্ত্যদৃষ্টিতে কখনও উর্দ্ধগামী, কখনও অধোগামী। সে কিন্তু উর্দ্ধাধোবিভাগের বাহিরে। সে খণ্ড আদর্শ প্রত্যেক প্রাণে স্বতন্ত্র। আর জগতের আদর্শ সেই খণ্ড-আদর্শ-সমষ্টির আদর্শ বই কিছুই নয়। সকল তারকামণ্ডলই যেন একটি কেন্দ্র তারার অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। সেইরূপ মানবসমাজরূপী মহাপ্রাণীর লক্ষ্য হইল সকল জীবের লক্ষ্যসমষ্টির লক্ষ্যমাত্র। এবং সেই কারণে মনুষ্যচরিত্রে যাহা সম্ভব, মনুষ্যস্বভাব যে যে

উপাদানে গঠিত, সে সকলই, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, প্রণয় অপ্রণয়, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সকলই এই ভগবৎ-আদর্শের অন্তর্গত হইয়া আছে। এই আদর্শ ই বিশ্বচক্ষে স্বপ্নের ন্যা ভাসিতেছে, কোন অলীক শিবসুন্দরের স্বপ্ন নহে। বৈকুণ্ঠে ভগবান যাহাই হউন, বিশ্বের ভগবান, তোমার আমার উপাস্য, মুক্তপুরুষ নহেন। এই বাস্তব ভগবানই জগৎরূপী মহাপ্রাণীর জীবনের গতির কারণ। তিনি আমাদেরই মত, আমাদেরই সহিত,—নিরন্তর সিদ্ধির জন্য সাধন করিতেছেন! আর এই সিদ্ধির পথে উত্থান পতন আছে! বিশ্বপথ ত সোজা পথ নয়। এ যে ভুজঙ্গগতি (curvilinear)। অথবা ইহাতে আবর্ত্ত আছে, ঘোরপাক আছে এ যে কুণ্ডলাকৃতি (spiral)! ইহাই ঐতিহাসিক আদর্শ মার্গ।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

আজ আমি এই বাস্তবমার্গেই চলিতেছি। পায়ের নীচে মাটি, তাহাতে অসংখ্য পদচিহ্ন, পথ হারাইবার ভয় নাই। কিন্তু কই, এ ত নীরেট মাটি নয়! এ মাটি যে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে, ধসিয়া যায়, আর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! এ যে অতল গহ্বরের উপর মৃত্তিকার লেপ, সর্ব্বত্র পায়ের জো

সহে না। ভাবিয়াছিলাম এবার ফাঁকাকে ফাঁকি দিয়াছি, কিন্তু দেখি ধরার এই প্রাচীন রাজপথও ফাঁপা, শূন্যের উপর প্রশস্ত জনপথ! মানবসমাজের চিরন্তন নিম্নস্তর যেন কোন্ পাতালের বিরাট গহ্বর! ঐ যে নিম্নে পায়ের তলে দুঃখময়ের দেশ, চিরন্তন আঁধারের আবাস, সেথায় চিরধ্বস্ত বিশ্বমানবের হাহাকার, হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, ঐ অতলস্পর্শে তল পাই কোথায়? ঐ আঁধার রাজ্যেই মানব-ইতিহাসের উৎপত্তি! ঐ আঁধারেই যুগে যুগে মানব-ইতিহাসের লয়! কত অন্ধযুগ (Dark Ages), কত মেবার বা মোগল পতন, কত ফরাসী বিপ্লব, কত কুরুক্ষেত্র বা আর্ম্মাগেডন (Armageddon),—সর্ব্বত্রই এই আঁধার রাজ্যে আসিয়াই পথের শেষ! আবার এই আঁধারেই নূতনের পত্তন, কত নূতন জাতির, নূতন সাম্রাজ্যের, নূতন সভ্যতার এই নিম্নস্তরের আঁধার হইতেই উত্থান! তাই এই ঐতিহাসিক জীবনেরও দেখি ফাঁকা হইতেই উৎপত্তি, ফাঁকাতেই লয়!

আজ বুঝিলাম জীবনে এই ফাঁকার মূল্য কি?—বসনে যেমন ছিদ্র টানা ও পড়েনের দরুণ, কার্য্যে যেমন কারণ, সেইরূপ জীবনের গতিতে এই অবকাশ, এই ফাঁকা-রাজ্য। সকল ধাতু যেমন খনিতে, সকল তাপ যেমন বসুন্ধরার গর্ভে, সেইরূপ যত উৎপাদনী যত সৃজনী শক্তির মূল এইখানেই,

উপাদানে গঠিত, সে সকলই, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, প্রণয় অপ্রণয়, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সকলই এই ভগবৎ-আদর্শের অন্তর্গত হইয়া আছে। এই আদর্শই বিশ্বচক্ষে স্বপ্নের ন্যায় ভাসিতেছে, কোন অলীক শিবসুন্দরের স্বপ্ন নহে। বৈকুণ্ঠে ভগবান যাহাই হউন, বিশ্বের ভগবান, তোমার আমার উপাস্য, মুক্তপুরুষ নহেন। এই বাস্তব ভগবানই জগৎরূপী মহাপ্রাণীর জীবনের গতির কারণ। তিনি আমাদেরই মত, আমাদেরই সহিত,—নিরন্তর সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছেন! আর এই সিদ্ধির পথে উত্থান পতন আছে! বিশ্বপথ ত সোজা পথ নয়। এ যে ভুজঙ্গগতি (curvilinear)! অথবা ইহাতে আবর্ত্ত আছে, ঘোরপাক আছে, এ যে কুণ্ডলাকৃতি (spiral)! ইহাই ঐতিহাসিক আদর্শ-মার্গ।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

আজ আমি এই বাস্তবমার্গেই চলিতেছি। পায়ের নীচে মাটি, তাহাতে অসংখ্য পদচিহ্ন, পথ হারাইবার ভয় নাই। কিন্তু কই, এ ত মীরেট মাটি নয়! এ মাটি যে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে, ধসিয়া যায়, আর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! এ যে অতল গহ্বরের উপর মৃত্তিকার লেপ, সর্ব্বত্র পায়ের জোর

সহে না। ভাবিয়াছিলাম এবার ফাঁকাকে ফাঁকি দিয়াছি, কিন্তু দেখি ধরার এই প্রাচীন রাজপথও ফাঁপা, শূন্যের উপর প্রশস্ত জনপথ! মানবসমাজের চিরন্তন নিম্নস্তর যেন কোন্ পাতালের বিরাট গহ্বর! *ঐ যে নিম্নে পায়ের তলে দুঃখময়ের দেশ, চিরন্তন আঁধারের আবাস, সেথায় চিরধ্বস্ত বিশ্বমানবের হাহাকার, হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস,* ঐ অতলস্পর্শে তল পাই কোথায়? ঐ আঁধার রাজ্যেই মানব-ইতিহাসের উৎপত্তি! ঐ আঁধারেই যুগে যুগে মানব-ইতিহাসের লয়! কত অন্ধযুগ (Dark Ages), কত মেবার বা মোগল পতন, কত ফরাসী বিপ্লব, কত কুরুক্ষেত্র বা আর্ম্মাগেডন (Armageddon),—সর্ব্বত্রই এই আঁধার রাজ্যে আসিয়াই পথের শেষ! আবার এই আঁধারেই নূতনের পত্তন, কত নূতন জাতির, নূতন সাম্রাজ্যের, নূতন সভ্যতার এই নিম্নস্তরের আঁধার হইতেই উত্থান! তাই এই ঐতিহাসিক জীবনেরও দেখি ফাঁকা হইতেই উৎপত্তি, ফাঁকাতেই লয়!

আজ বুঝিলাম জীবনে এই ফাঁকার মূল্য কি?—বসনে যেমন ছিদ্র টানা ও পড়েনের দরুণ, কার্য্যে যেমন কারণ, সেইরূপ জীবনের গতিতে এই অবকাশ, এই ফাঁকা-রাজ্য। সকল ধাতু যেমন খনিতে, সকল তাপ যেমন বসুন্ধরার গর্ভে, সেইরূপ যত উৎপাদনী যত সৃজনী শক্তির মূল এইখানেই,

এই ফাঁকে। শিল্পী এখান হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া মাটিতে রসান দিয়া শিল্পমূর্ত্তি গঠন করে। এই যে স্বভাব-শোভা, এই যে রাশিচক্র, এই যে বিশ্বের রাসমণ্ডল, ইহা সব ফাঁকারাজ্যের রসেই গঠিত। এই ফাঁকা হইতেই যত আঁকাজোকা। এই ফাঁকা হইতেই কায়ার সৃষ্টি, নীরূপ হইতেই রূপের বিভ্রম। যাহা ব্যক্ত তাহার স্বরূপ অব্যক্ত, যাহা নির্ব্বচনীয় তাহার মূলে একটী অনির্ব্বচনীয়। যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে, রূপ হইতে অরূপে না যায়, যাহার গতির পর অবকাশ না আসে, সে তত্ত্বের সন্ধান পায় না, রসের স্বাদ জানে না। পরব্যোমে যেমন অনাহত শব্দ আছে, তেমনি যাহা স্বপ্রকাশ তাহারও পশ্চাতে একটী শূন্য আছে। এই শূন্যটাই সৃষ্টিস্থিতির সন্ধিস্থল। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই যত যাওয়া আসা, যত নিঃশেষ করা ও ভরিয়া তোলা, যত আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, যত জোয়ার ভাটা, যত আলো আঁধার। এই ফাঁকাটী না থাকিলে দুনিয়া ফাঁক হইত। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই আমি কেবলই যাওয়া আসা করিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

২—মাঝে থাকা

দরশন লাগি বর নাহি মাগি!

আমি? সাগর সৈকতে আমি একটি বালুকণামাত্র। বালুকণা বলিয়া এ সাগরের কুল-কিনারার সন্ধান রাখিনা, আদি-অন্তের সীমা জানিনা, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই, শুধু মধ্যে থাকাই আমার ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের প্রকাশই আমার জীবন।

এ সৈকতে আমার ন্যায় বালুকণা অগণিত। কিন্তু তাহাদের সহিত আমার প্রভেদ আছে। তাহারা সাগরের জোয়ার ভাটার খেলার সামগ্রী—স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে আছে। সেই জোয়ার ভাটার টানেই তাহাদের অনুভূতি, সুখদুঃখ, উৎসাহ ও অবসাদ, আলো ও আঁধার, ভাসিয়া উঠা ও ডুবিয়া যাওয়া। যদিও তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বধর্ম্ম আছে, তথাপি তাহাদের স্বার্থ বিশ্বরাজার অর্থের অধীনে, তাহাদের স্বধর্ম্ম বিশ্বরাজার বিশ্বধর্ম্মে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের জঠরে ক্ষুধা আছে, তালুতে পিপাসা আছে, জীবনে সংগ্রাম আছে, জ্ঞানে অসঙ্গতি

আছে, কিন্তু সে ক্ষুধার, সে পিপাসার, নিবৃত্তি আছে, —সে সংগ্রামের শাসন আছে, মীমাংসা আছে,—সে জ্ঞানের চরমে সঙ্গতি আছে। "আমি তোমারই অঙ্গ-বিশেষ, অন্তিমে আমি তোমাতেই সঙ্গত হইব" এই চির-সঙ্গম আশায় শান্ত হইয়া তাহারা প্রাণিধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্ম, রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা হইল বিশ্বরাজ্যের প্রজা, রাজার ধর্ম্মে রাজ্যের এলাকায় সুখে স্বার্থে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াই তাহাদের অধিকার। আমার কিন্তু তাহা নয়। আমি একটি বিদ্রোহী প্রজা। আমি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিতে চাই, হোক্ না কেন সে বালুকণার রাজ্য। বিশ্ব-ধর্ম্মে আমি স্বধর্ম্ম খোয়াইব না, বিশ্বের মূল্যে বিকাইব না।

এতদিন কে যেন আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আমি পুনরায় মাথা তুলিতে শিখিয়াছি। ডুবি নাই, আর ডুবিব না। যে সাগর হইতে উঠিয়াছি, সে সাগরে ডুবিব না। ধীবরেরা জাল পাতিয়া অতল জলধি হইতে শুক্তিকা তুলে, আর দৈবক্রমে যদি কোন মুক্তা জাল কাটিয়া ধীবরের হাত এড়াইতে পারে, তবে—তবে সে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়! আমি কিন্তু অতল জলধি-গর্ভে প্রাণ হারাইব না। উর্ণনাভ সযত্নে জাল বুনিয়া

আমাকে তাঁহার ফাঁদে বন্দী করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু সে মায়াবীর জাল কাটিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছি। আমি প্রাণ হারাইতে পারি না, ডুবিলেও নিজগুণে স্বধর্ম্মপ্রভাবে শোলার ন্যায় ভাসিয়া উঠি। সাগরে মুক্তাবাহী (Nautilus) নটিলাসের ন্যায় সন্তরণ করিতে করিতে কোথায় ভাসিয়া যাই!

এ লঘুত্ব কি যৌবনের ধর্ম্ম? বার্দ্ধক্যে কি গুরুত্ব মিলে? ওজনে ভারি হইতে শেখা যায়? না, প্রাণের বয়স নাই, জরা নাই। বিশ্বের বশ্যতাই তাহার জড়তার, স্থবিরত্বের, মূল। মহতের অধীনতাস্বীকার, ভূমার আশ্রয় লাভই, ক্ষুদ্রের প্রকৃত শৃঙ্খল।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ড চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, এবং পরিণামে চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হয়। পরশমণির সংস্পর্শে বালুকণাও স্বর্ণে পরিণত হয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে পার্থিব বস্তুমাত্রেই মৃত্তিকার উপর পতিত হয়। আমার সম্বন্ধে কিন্তু তাহা খাটিবে না। পরের মূল্যে নিজেকে বিকাইব না। পরশমণির সংস্পর্শে সোণা হইতে চাহি না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তবু যেন পৃথিবীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার প্রাপ্ত না হই। বেলাভূমিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব।

বালুকণা জ্বলে, পুড়ে, কিন্তু ভস্মসাৎ হইয়া মাটিতে মিশাইতে জানে না।

বালুকণার কথা বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। বালুকণা হইয়া একপার্শ্বে থাকিতে পারি কৈ ? আমি এক-রত্তি বালুকণা, কিন্তু বালুকণা হইয়া অভ্রের গুণ পাইয়াছি। আমি স্বচ্ছ হইয়াছি। আমি জ্বলিয়া উঠিলে যে বিশ্বের ছায়া আসিয়া আমার উপর প্রতিবিম্বিত হয়। আর সেই প্রতিবিম্বে আমার প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আবছায়া, অর্দ্ধছায়া, খণ্ড আকৃতি দেখিয়া কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি আসে না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া সমগ্রের প্রতিবিম্বও ধারণ করিতে পারি না। তাই রস-ভঙ্গ করাই আমার ব্যবসা !

পুড়িয়া মরা হইল না। প্রাণের মায়া তাছে বলিয়া পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপ দিয়া ছাই হইতে চাহি না। তবে করি কি ? আমি মাঝে থাকিতে চাই। কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। হায় ! বালুকণা না হইয়া পাখী হইলাম না কেন ? কবিত্বের ডানা মিলিলে ঐ আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া গান গাহিয়া গাহিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম। মাটিতে আর নামিতাম না। বালুকণার আবাস বেলাভূমিতে। আকাশে ও বেলাভূমিতে যে অনেক

খানি ব্যবধান। ঐ উপরের আকাশ ছেড়ে এত দূরে থাকিতে মন সরে না। আবার আকাশে, শূন্যে, মিলাইয়া যাইতেও পারি না। মাঝে থাকিতে চাই। আকাশের কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। পাখী হইলাম না কেন? উড়িতে শিখিলাম না কেন? দুটা ডানা থাকিলে আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া সুখ পাইতাম।

অথবা ভ্রমর হইতে পারিলে মন্দ হইত না। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুপান করে। কানন ও মধুচক্রের মধ্যে যে পথ আছে সেইখানেই সে বিচরণ করে, আর তৃষিত প্রাণের পিপাসা নিবারণ হইলে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে বসিয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সে পরের পীযূষ শোষণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। কিন্তু এই মধুমক্ষিকাবৃত্তি আমাকে রাখিতে পারিল কই? আমার আজ বনপথে বিচরণ শেষ হয়েছে। আজ আমার রসকর্ম্ম নাই, কিন্তু এই রসের ভাণ্ডার লইয়া করি কি? এই রসই আমার বালাই। ফেলিতেও পারি না, পান করিতেও পারি না। এ যে নিজের রস। তাই অপরকে মধুদান করিবার নিমিত্ত এই রসের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। হায়! জীবের ভাগ্যে স্বতন্ত্রতা কোথায়? বলিতে চাই, না না, —কে যেন বলায়, হাঁ হাঁ! স্কন্ধে যুগভার, মাথা নাড়িয়

ফল কি ? এই বাহকবৃত্তিই কি তবে আমার [illegible] ? ইহাও কি দাসত্ব নহে ? হউক, তথাপি দাস্যবৃত্তি করিতে করিতে কোনও প্রভুর হাতে মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। প্রভুর মর্য্যাদা আছে, দাসীর কি মর্য্যাদা নাই ? রসের বোঝা বহন করিতে করিতে যেন সুধারসে স্বরসে একরসে গলিয়া না যাই। সোহাগিনী আদরিণী হইব না। কেবল আড়ালে থাকিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া দাস্যবৃত্তিই শ্রেয় মনে করি।

যখন রস বহন করাই আমার ধর্ম্ম তখন নিজেকে দাস না বলিয়া বাহন বলি। বুঝিলাম এ ত নিজ রস নয়, কোন দেবতার সুধাসম্ভার বহন করিতেছি। আমি দেবতার বাহন। দেবতা যখন ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তখন বাহনেরও প্রয়োজন আছে।

আমি কেবল দেবতার বাহন নই, আমি আবার ভক্তেরও সোপান। আমি আজ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আনা-গোনার পথ। কিন্তু পথ শুধু বাঞ্ছিতের সঙ্গমে লইয়া যায়। পথের জন্য সে সঙ্গম নহে।

এতাবৎকাল দুই লইয়া আলোচনা করিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনও যে আবশ্যক নতুবা আমার স্থান কোথায় ? ভক্ত ভগবান, সাধ্য সাধনা, কর্ম্ম

কর্ত্তা, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, লক্ষ্য উপলক্ষ্য,—এই দ্বন্দ্ব লইয়া আর কতকাল ঘুরিব! সাধনার সোপানে সাধ্যের অনুগামী হইয়া এতাবৎকাল ছুটিয়া আসিলাম, কিন্তু যতই উঠি, যতই অগ্রসর হই, ততই সাধ্য দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়ে। প্রাণে আবার আকুলতা আসে, আবার অবসাদ, আবার মোহ!

তাই এবার সোপান হইয়া মধ্যে থাকাই স্থির করিয়াছি। —তাহাতে কোন বালাই নাই। সাধ্যের পথের পথিকেরা, সোপানে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশে যাত্রা করুন। সোপান শুধু বুক পাতিয়া তোমাদের দেহভার বহন করিবে। এই পাষাণ রূপ ধারণ করিয়া মানবের বাহন হইয়া ধন্য হইব। পাষাণী অহল্যা ভবিষ্য অবতারের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি কাহারও পদরেণু-স্পর্শে মুক্ত হইবার আশা রাখি কি?

স্বেচ্ছায় অবমাননার ভার বহন করাই আজ আমার মাথার মণি। আজ সকলকার ধুলা, সকলকার বোঝা, মস্তকে লইয়া স্বেচ্ছায় আপনার মান খোয়াইয়া পড়িয়া আছি। একদিন যে আমি তাঁহারই পিয়ার ছিলাম। সে দিন ভগবানের সাকীর পানপাত্র বহিবার প্রয়োজন ছিল। আজ আর সাকী হইতে চাহি না। আমি আজ সেই ভাঙ্গা

পেয়ালা, তাঁহার পানের শেষে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছি। সংসার আমাকে পদদলিত করিয়া উল্লাস করুক। আর আমি স্বপদভ্রষ্ট হইয়া সেই আনন্দে সহায়তা করি। তবে আজ এই স্বপদচ্যুতি, স্বধর্ম্মের নাশই, আমার ধর্ম্ম হউক।

না, না, কি বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। পাষাণে আবার উত্তাপ কেন? বিক্ষোভ কেন? শীতল, অসাড়, না হইলে সোপান হইব কেমনে?—

আমি মাঝে থাকিতে চাই। মর্ত্ত্যে মধ্যবর্ত্তীরও প্রয়োজন আছে। মধ্যবর্ত্তীর ভিতর দিয়াই সকল প্রকাশ, সকল পূরণ, সকল মিলন। তাই সূর্য্যের কিরণধারা যেন কোন্ দৌত্যচর্য্যায় সাগরবক্ষ হইতে বাষ্প উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করে। পীযূষভারাবনত স্তনের ভিতর দিয়া শিশু মাতৃবক্ষ হইতে শোণিত শোষণ করিয়া কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়। ভাষার অভিব্যক্তিতেই ভাব বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। অনাহত ওঙ্কার রূপেই ব্রহ্ম প্রতি-প্রাণে শব্দপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করেন। ছায়াময়ী কায়া দেখিয়াই বিশ্বরূপের অস্তিত্বের নিদর্শন পাইয়া থাকি।

কেবল বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে নয়—উভয়ের সঙ্গম-ক্ষেত্র ঐতিহাসিক জগতেও এই মধ্যবর্ত্তীরই অভিনয় দেখিতেছি। ভগবান ও মানবসন্তান (Son of Man,

Universal Humanity) থাকিলেও লীলার জন্য পারিষদেরও উপযোগিতা আছে। অবতারী নারায়ণ ও বিরাট জীবসমষ্টি থাকিলেও যুগাবতারের প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস এক মহাপুরাণ, যুগাবতারকাহিনী, নর-নারায়ণের কথা।

শুধু তাই নয়। জীবচৈতন্যের অস্তিত্বই এই মাঝে থাকায়। ব্রহ্ম ও বিশ্বরূপ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণও প্রার্থিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সুখদুঃখময় মনেরও প্রাধান্য আছে, নতুবা এ দ্বয়ের উপলব্ধি করিবে কে? সঙ্গমস্থল কোথায়?

সেই নিমিত্তই বুঝি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তিনের উল্লেখ আছে: পিতা, পুত্র, পবিত্র-আত্মা। তাই পুত্র যীশুখৃষ্ট মধ্যবর্ত্তী-রূপে মানবসন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত আনাগোনা করিবেন। আর তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ঘাটে ঘাটে মাথা রাখিয়া পাপীতাপীদিগকে "আয়! আয়!" বলিয়া ডাকিয়া-ছিলেন। আজও কি বিশ্বমানব ধর্ম্মসংস্থাপক খৃষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া নাই? আজও কি ভক্তগণ হৃদয়ে মহাপ্রভুর সেই "আয় আয়" ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন না? নতুবা ভক্ত বৈষ্ণব কবি গাহিবেন কেন, "গৌরাঙ্গ আমার, নাচত আবার"।

কে তুমি, মাঝে আসিয়া যুগে যুগে মর্ত্ত্যবাসীকে ডাকিতেছ! একদিন আমি সেই ডাক শুনিয়াছিলাম। আজ আমিই তোমার ডাক। আমি তোমার হাতে মুরলী। মুরলী কিন্তু নিজে বধির। মুরলীর জন্য সে ডাক নহে!

কে তুমি? হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া প্রত্যেককে আকুল করিতেছ; সেই আহ্বান শুনিয়া কতজনে আপন কুটীর ছাড়িয়া সমাজ ও সংস্কারের রুদ্ধ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কোন্ অজানা পথে ছুটিতেছে, যেন বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সে স্রোতের টানে কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ ভাসিতেছে, কেহ ডুবিতেছে। কোন কোন মাঝি আপন জীর্ণ তরণীটি ঘাটেও বাঁধিতে পারিয়াছে, আবার কেহ কেহ অকুলের সন্ধানও পাইয়াছে।

কে ডাকে ঐ, আবার আবার, "আয় আয়"! "আয় আয়"!! ঐ কি মায়াবিনী ডাকিনী (Siren) সাইরেনের গান, যাহা শুনিলে সংসারের মায়াবন্ধন সকলই টুটিয়া যায়, অবশেষে কোন্ অজ্ঞাত সাগরসৈকতে দেহের জীর্ণ কঙ্কাল শুকাইতে থাকে! কে গায় ঐ! কি গায় ঐ! ঐ কি নিয়তির তান?

এ জগতে ডাকার শেষ হইল না। চাওয়ারও শেষ হইল না। কিন্তু ডাকে কে? চায় কে! তুমি না আমি!

আজ আর কেহ ডাকে না। হৃদয়-গহনে সেই চির-পরিচিত মুরলীধ্বনি বাজে না। আজ যেন কোন অসীম নীরবতা, চিরস্তব্ধতা, মহাশূন্যের ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আপনি মরিয়া আমাকে ডাকিয়া তুমি পলাইয়াছিলে, আমি তোমার দিকে ধাইয়া তোমাকে পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরের জন্য, তোমার জন্য—শ্রীরাধিকা যেমন গোপিনীদিগের জন্য রাসলীলা পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন,—আমিও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না! তাই আজ আমি পলাতক, তোমায় অস্বীকার করি, দূরে সরিয়া দাঁড়াই!

দরশন লাগি বর নাহি মাগি!

কিন্তু কৈ যাহাদের জন্য আসিলাম, যাহাদের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলাম, তাহারা ত আমাকে গ্রহণ করিল না! তোমার সঙ্গদোষ যে আমার অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে, তাই আর আমাকে কেহ চিনে না, কেহ ডাকে না, কেহ চায় না। তুমি আমার উপর মান করিয়া নীরব হইয়া রহিলে, আর অপরে আমাকে ঘৃণা করিয়া

বর্জ্জন করিল ; তাই একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া মাঝে পড়িয়া গেলাম !

দরশন লাগি বর নাহি মাগি !

হে আমার নীরব প্রভু ! তুমি আজ গোপনে, অন্তর-তলে, নীরব হইয়া থাক। আজ আর আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিও না। আপনার নিষ্ফলতা নাশে আপনাকে ক্ষুদ্র ও হীন করিও না। তোমার সেই গুহাহিত অনির্ব্বচনীয় রহস্য হারাইও না। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খোলে নাই, যাহারা আবরণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিরাবরণের সাক্ষাৎ পায় নাই, তাহারাই কেবল রূপের অভাবে অন্ধকার দেখে, সতত বহিঃপ্রকাশ চায়। কিন্তু হে প্রভু! আজ আমি আমার দর্শনে, আমার স্পর্শনে, আমার আস্বাদে, আমার অনুভূতিতে, তোমাকে পাইতে চাহি না। আজ তুমি তোমাকে ব্যক্ত না করিলেই আমি তোমাকে পাই। আজ তোমার মহাশূন্যে শুদ্ধ নীরবতা, তোমার আঁধার সাগরে তলহীন স্তব্ধতা, আমার অনুরাগের জ্বলন্ত অননুভূতিতে জাগিয়াছে। তোমার সর্ব্বান্তক প্রণয়মহিমা আমাকে স্তব্ধ করিয়াছে !

দরশন লাগি বর নাহি মাগি !

তাই বলি হে আমার দেবতা, তুমি আজ আমার অদৃশ্য,

অস্পৃশ্য, অবোধ্য, অনির্ব্বচনীয়। তুমি কি আমার উপর অভিমান করিয়া নীরব হইয়া আছ! আজ তোমার অভিমানেরই জয় হউক! এ জগতে আমার জন্য, হে স্বামিন্, তোমাকে যেন আর জন্মমৃত্যুর পথে ঘুরিতে না হয়। তাই তোমারই জন্য তোমার বিদ্রোহী হইয়াছি। আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না!

দরশন লাগি বর নাহি মাগি!

কিন্তু নাথ! তোমার অবোধ সৃষ্টির প্রতি তুমি অভিমান করিও না! সৃষ্টিকে তুমি ডাকিও। তুমি না ডাকিলেও আমি তোমাকে চিনি, কিন্তু সৃষ্টি যে তোমার ডাক না শুনিলে, তোমার রূপ না দেখিলে, পথভ্রান্ত হয়। তুমি তাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া, জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, ডাকিতে থাক। নাথ, সৃষ্টিকে তোমার মণিকোঠার আঁধারে দর্শনের নিমিত্ত ডাকিয়া লও, আর আমি মন্দিরের বহির্দ্বারে তাহাদের সোপান হইয়া পড়িয়া থাকি।

দরশন লাগি বর নাহি মাগি!

আমি শুধু আমার বুক পাতিয়া তাহাদের নিমিত্ত সোপান রচনা করি। তোমার সৃষ্টি এই সোপান অবলম্বন করিয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমপরম্পরায় তোমার সহিত মিলিত হইতে থাকুক্। আমি যেন তোমার

ও তোমার সৃষ্টির সন্ধিস্থল হইয়া থাকি। তীর্থযাত্রীদের দেহভার বহন করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রার পথের ন্যায় ধন্য হই। এই ছায়ার কায়া আশ্রয় করিয়া সকলকে তোমার অনন্তরূপ দেখাই।

ব্যোমকেশ! উপরে অজ্ঞেয় রহস্যরূপী তুমি, আর নিম্নে মানব-সমষ্টিরূপী তোমার অপরিমেয় সৃষ্টি, মধ্যে শুধু আমি। যেন পাতাল হইতে স্বর্গধামের উদ্দেশে কোন গগনস্পর্শী সোপানাবলি, মাঝে থাকিয়া কেবল সেই শূন্য রহস্যের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া আছি!

সঙ্গমে

সঙ্গমে

১—সুখময়—দুঃখময়

সুখময় দুঃখময়

আমি

মন

জ্ঞান

হৃদয়

(স্থান—দুঃখময়ের দেশ)

মন।—পারিলাম কৈ ? পারিলাম কৈ ? আকাশে উড়িতে গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। বহু সাধনার ফলে, বিপুল আশার বলে, উড়িতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু কৈ পারলাম না ত! ভগ্নহৃদয়ে মাটিতে পড়িয়া গেলাম। অশক্তি, অযোগ্যতা, নিষ্ফলতা, যেন আমায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাই আজ প্রাণ থাকিতেও মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমি।—বিশ্বে কেহ মরে না, কেহ মরে নাই। তবে মাঝে মাঝে সকলেরই গতিরোধ হয়। তোমার আজ গতিরোধ হইয়াছে, তাই এই শূন্যতা।

মন।—শূন্যতা? এই শূন্যতার মধ্যেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চলিতেছে। প্রাণ থাকিতে আমায় এই শূন্যতার কবরে পুঁতিল কে? ঐ দেখি উন্মুক্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর আমাকে এই ফাটলে চাপিয়া রাখিল কে? এই খোলা আকাশ দেখিয়া পিঞ্জরে থাকিতে সাধ হয় কার? সেই স্বাধীনতার ব্যাঘাতে, স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিঘাতে, আজ হতাশ হইয়া আছি। বনের পাখী বনে বনে গান গাইব, আকাশে উড়িব, ফলে ফলে বিহার করিব, এ পিঞ্জর আমার ভাল লাগে না।

আমি।—পিঞ্জরে পুরিবে তোকে? এত সাধ্য কার? স্বাধীনতা হরণ করিবে তোর? সে কে? তোর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকূল কে? সে যে আমি! আমিই তোকে শৃঙ্খলে বেঁধেছি। আমার অধীনে তুই থাক্‌বি এতটুকুও তোর প্রাণে সহে না! আজ এখানেই থাক্। আর উড়ে কাজ নাই।

মন।—তবে তাই হোক্। আমার ডানা আছে কি না তাই আমার বড় উড়িতে সাধ হয়। আজ তবে পিঞ্জরেই থাকি। আজ এই পৃথিবীকে ফেলিয়া

আকাশে উড়িব না। মাটিই আমার ভাল। এ বিশ্বে কেহ উড়ে না, তাই বুঝি আমারও উড়িতে নাই ?

আমি।—না, তাই আর উড়িও না। দুঃখের উদ্ধারের জন্য এদেশে আসিয়াছি, তাহা ফেলিয়া আকাশে উড়িতে চাও কেন! মন আমার, দেখ এখানে কে পড়িয়া আছে।

মন।—এ কে! বুঝি আমারই মতন উড়িতে গিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। যেন কে ইহাকে ডানা কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। না না, এও বুঝি আমারই মত এক শৃঙ্খলে বাঁধা বিহগ ? কিন্তু এ প্রাণ আমার থেকে কত বড়। এ যেন এই বিশাল বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছে।

আমি।—যেন এক প্রকাণ্ড বিহগ ডানা মেলিয়া এই বিশ্বকে তাহার ডানার আবরণে ছাইয়া আছে। এই দুটা ডানাই কি তবে বিশ্বে রাহু ও কেতু ? তবে এই কি দুঃখময় ভগবান ?

জ্ঞান।—হাঁ, সেই পূর্ণ ভগবানেরই অঙ্গ, এক অংশ মাত্র। এ অংশটুকুও আবার কত ভাগে বিভক্ত, ইহাকে

যেন কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কত প্রাণে প্রাণে ইহার স্থিতি, কত কণ্ঠে কণ্ঠে ইহার শ্বাস, কত হৃদয়ে হৃদয়ে ইহার স্পন্দন, কত জীবে জীবে ইহার বন্ধন!

আমি।—এই কি দুঃখময়ের দেশ? কৈ এ রাজ্যও ত আঁধার রাজ্য নয়। এ দেশও সবুজ, পৃথিবীর মতই সবুজ। মর্ত্ত্যের মত এখানেও উপরে নীলাকাশ, ও সেই আকাশের নিম্নে অতল জলধি। এ আকাশেও রঙ্ বেরঙ্এর মেলা বসে, ও সেই রঙ্এর আভা মাটিতে পড়ে। এ আকাশেও চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, এ আকাশ-কেও মেঘে ঢাকে। এ নীল সাগরে তুফান উঠে, ভেলা ভাসে। এ মাটিতেও বীজ আছে। এ দেশেও গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ঝুলে। এ ক্ষেত্রেও কৃষী লাঙ্গল চষে, ধানও জন্মায়।

হৃদয়।—এ জগৎ ত সৃষ্টিছাড়া নয়। এখানে সবই আছে। আর এই সর্ব্বসমষ্টিতেই দুঃখময়ের প্রাণ।

আমি।—এ দুঃখময়ের সৃষ্টি করিল কে? আমি এতদিন

এই দুঃখময়ের সন্ধানেই ফিরিতে ছিলাম। এই দুঃখময়কে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আসিলাম, এখন দেখি সে পথ বন্ধ।

মন।—তাই আমার গতিরোধ হয়েছে!

আমি।—ভগবান ত সচ্চিদানন্দ। তিনি পূর্ণ। যাহা পূর্ণ, তাহাতে অপূর্ণের স্থান কোথায়? যিনি আনন্দময় তাঁহাতে দুঃখময় কেমনে থাকে?

জ্ঞান।—যেমন অনন্ত আকাশব্যাপী দিঙ্‌মণ্ডল গোলাকৃতি ও গোলাকারেই পূর্ণ পরিমাণ, তেমনি ভগবানের পূর্ণতারও এক নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ পরিমাণ আছে। সেই অবস্থাতে তিনি পূর্ণরস ও অখণ্ড আনন্দ। কিন্তু এই পূর্ণানন্দের পরিমাণও পরিমাণ, ও সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করিতে গিয়াই তাঁহার আনন্দভাণ্ডার মাপ ছাড়াইয়া উথলিয়া উঠে ও সাগরসৈকতে পূর্ণিমা রজনীর জোয়ারের ন্যায় নিরন্তর বন্যার ধারায় বহিয়া যায়। ভগবান্ সেই বাড়ন্ত রস দান করিতে গিয়াই দুঃখময়ের সৃষ্টি করেন: এই দুঃখময়ই তাঁহার দানের আধার। কারণ তিনি পূর্ণাঙ্গ হইলেও তাঁহার দান পূর্ণ

নয়। তিনি তাঁহার ভূমানন্দের কণামাত্র বিলাইতে পারেন। জীব সেই সুখময় দুঃখময়ের দানলীলার বিলাস-ভূমি। স্বীয় শক্তি অনুসারে জীবকে সেই দান লইয়া বর্দ্ধিত হইতে হয়। সৃষ্টি ত সৃষ্টি নয়, কিন্তু আত্মদান, আর নেই দাতা ও গ্রহীতার বৈষম্য, ব্যবধান, বিচ্ছেদ,— দান করিতে গিয়াই ভগবান হন সুখময় দুঃখময়।

আমি।—ভগবানের কথা কেমনে বুঝিব! আমি নিজের কথাই শুধু জানি।

জ্ঞান।—সেই নিজের কথা দিয়াই ভগবানকে বুঝিতে হয়।

আমি।—নিজের কথা? আমি ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু এ ক্ষুদ্রেও আনন্দভাণ্ডার একদিন বর্ষার ভরাগাঙ্গের ন্যায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন, জানিনা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, স্বপনে কি জাগরণে, যেন কিসের বিঘোরে, যেন বিজলীর চমকে, নয়নের পলকে, দান করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যে দান লইল সে ত আমার ধনে ধনী হইতে পারিল না। আমি রাণী, সে ভিখারী, কই ভিখারী ত রাজ্যপাট পাইল না। সেই আমার দুঃখ।

জ্ঞান।—ভগবানের সম্বন্ধেও সেই একই তত্ত্ব।

আমি।—সেই অবধি আমার অন্তরে সুখ দুঃখের যুগল বিগ্রহ উদিত হইয়াছে, সেই অবধি আমি দ্বন্দ্বাত্মক, এক নহি।

জ্ঞান।—তাই ভগবানেও একজন দুঃখময় আছেন।

আমি।—সত্য। আমাতেও ত একজন সুখময় ও একজন দুঃখময় আছে। তাই সুখ চায় দুঃখকে, দুঃখ চায় সুখকে।

বুঝি আমি তাঁহারই আদর্শে আমার মনের মধ্যে ছোট করিয়া এক সুখময় ও দুঃখময় গড়িয়া রাখিয়াছি।

কেমনে এই দুঃখময়ে ও সুখময়ে সঙ্গম হইবে? দুঃখময়কে উদ্ধার করিবে কে?

আদিতে কে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল! এক দুই হইল কেমনে? আবার দুই এর জন্য তৃতীয়! সেই তিন হইতেই বহু! এই বহু হইবার সঙ্কল্প কোথা হইতে আসে?

জ্ঞান।—একটি রূপকথা বলি। কল্পের আরম্ভে এক পুরুভুজ সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে দিনে

দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিল। এক দৈবমুহূর্ত্তে সে আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। এই দৈবমুহূর্ত্তেই, এই নিজের অর্দ্ধাংশ বিলাইয়া দেওয়াতেই, জাতিরক্ষার সূচনা হইল। সেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও এক মহাপ্রাণী, একটি বিরাট-কায় পুরুভুজ বই ত নয়। এই পুরুভুজের প্রণালীতেই কি নীহারিকা হইতে সৌরজগতের উৎপত্তি হয় নাই! এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই কি বিবর্ত্তন-ক্রমপরম্পরায় আদি জীবাণুপুঞ্জ হইতে সমাজদেহ পর্য্যন্ত জৈবধারা চলিয়া আসে নাই? সর্ব্বত্রই এই ধারা। তাই আদিপুরুষই আদি পুরুভুজ, আর তাই বহু হইবার সঙ্কল্প।

হৃদয়।—শুধু তাই নয়। এই জৈবধারাতে একদিন জননক্রিয়ার সহচর হইল মৃত্যু! শিশুটিকে জন্ম দিয়াই জননীর কাল ফুরাইল। এই মরিয়া জন্ম দেওয়াই স্বভাবের আদি নিয়ম। না মরিলে নবজীবনের অবসর কোথায়? লতাটি শুকাইলে তাহার সেই শুঁটীর মধ্যে বীজটি কি থাকে না? শুকনা ফুলের গন্ধ, ঝরা ফুলের

সৌন্দর্য্য, কি আমার স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকে না! রাগিণীটি লয় হইবার পূর্ব্বে তাহার ছন্দটি কি প্রাণের বীণাতে ঝঙ্কারিত করিয়া যায় না? এইরূপে আপনাকে একবার বিকাইয়া দিতে হয়। ইহাই মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইবার পথ। ইহা প্রাণ দেওয়া নয়, প্রাণ পাওয়া। আর সেই আদি মাতার ন্যায় প্রাণ না দিলে জগৎকে রক্ষা করিবে কে? ইহাকে খাদ্য না দিলে ইহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে কেমনে?

জ্ঞান।—এই ব্রহ্মাণ্ডটি যদি একটি বিরাটকায় পুরুভুজ, তবে জীবমাত্রই তাহারই অঙ্গ, বিশ্লিষ্ট অঙ্গ। আর সেই জীব আকৃতিতে ও শক্তিতে হীন হইলেও জন্মদাতা বিরাটেরই প্রতিরূপ। তাই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও সে তাহার জাতীয় ধর্ম্ম হারায় না। ক্ষুদ্র পুরুভুজটি এই জাতি-ধর্ম্মগুণে, কোন্ এক অজানা লক্ষ্যের উদ্দেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে জানে না, যে জাতিরূপের অভিব্যক্তিই তাহার এই ক্ষণিক সমুদ্রকেলির নিয়ন্তা। অকস্মাৎ দৈবমুহূর্ত্তে তাহাতে একদিন জাতীয় ভাগ্য পুনরায় অভিনীত

হইল। সেও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আত্মদানে নবজীবন সৃজন করিয়া গেল।

আমি।—বুঝিলাম, আমরা সেই পুরুভুজের অংশ। তাই মরিয়া নবজীবনের জন্ম দেওয়াই আমাদের জাতীয় ভাগ্য। কিন্তু সকলেই যদি মরিব বাঁচিবে কে! কিসের জন্য মরি? কাহার জন্য মরি? মরণের জন্য? সর্ব্বত্রই খণ্ডজীবন, সর্ব্বত্রই নিষ্ফল মৃত্যু, ইহাই দুঃখ। এই দুঃখের উদ্ধার করিবে কে? সকল সত্তাতে আছে একটা নাই নাই, একটা অপূর্ণতা, একটা নিষ্ফলতা। হায় দুঃখ! হায় দুঃখময়! তোমার উদ্ধার কোথায়?

হৃদয়।—এই অপূর্ণকে পূর্ণ করবার চেষ্টাই, এই নিষ্ফলতার ভিতর সফলতার আশাই, হইল জীবন।

আমি।—কোন্ সফলতার আশায় বীজ হইতে অঙ্কুর-উদ্গমে এক শাখা পল্লব শোভিত বৃহৎকায় বিটপীর উৎপত্তি হয়? কিন্তু হায়! এ বনস্পতিও কি একদিন আকাশের মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া যায় না? অণ্ডজ কেন একদিন ডিমের আবরণ

ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, ও ডানা ফুটিলে আকাশে উড়িয়া উড়িয়া গান গাহিয়া বেড়ায়? কিন্তু এই গান গাইতে গাইতে কি একদিন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে না! বন্ধুর পর্ব্বতভূমিতে হঠাৎ মাটি ফাটিয়া এক উৎস নির্গত হইল, এবং সেই উৎস আপন প্রবাহে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া সাগরে পতিত হইল। কিন্তু সাগরসঙ্গমে সে কি তাহার নিজধারা হারাইয়া ফেলে না? আবার কি সে কোন দিন কলকল স্রোতে আপন ধারায় বহিয়া যাইবে? সর্ব্বত্রই দেখি নিষ্ফলতার পর সফলতা, সফলতার পর নিষ্ফলতা, বিরামের পর গতি, গতির পর বিরাম,—এত সোজা পথ নয়! কোথাও বা ভুজঙ্গগতি (curvilinear), কোথাও বা কুণ্ডলাকৃতি (spiral)! এ চক্রের উদ্দেশ্য কি! এ ধাঁধার শেষ কোথায়? এ বিশ্ব-পথে কি দুঃখময়ের উদ্ধার মিলে?

জ্ঞান।—উদ্ধার? উদ্ধার ত নিত্যসিদ্ধ, নিত্যলীলা! জীবে জীবে যুগে যুগে সেই নিত্যলীলাই নূতন করিয়া সাধিত হয়। এই নিমিত্তই মাতৃগর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃবক্ষ হইতে রক্ত শোষণ করিয়া

কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়। ধরার এই একছত্র রাজা, মানবসমাজের সকল সেবার অধীশ্বর, ত্রিদিবের স্বপ্নে মহিমা-মণ্ডিত, এই বাল গোপালই কি একদিন প্রভুত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখময়ের উদ্ধারের নিমিত্ত আপনাকে সংসারপথে উৎসর্গ করে না ?

আমি।—কিন্তু কৈ পারিল কৈ ? পারিলাম কৈ ? আজ পর্য্যন্ত ত এই দুঃখময়কে কেহ উদ্ধার করিতে পারিল না। সর্ব্বদুঃখের শান্তি কোথায় ? সর্ব্ব-মুক্তি কি অলীক স্বপ্ন ? হায় বোধিদ্রুম !

হৃদয়।—দান পথেই দুঃখের উদ্ধার। জীব দান করিয়া নিঃস্ব না হইলে এ পালার শেষ কোথায় ? সুখ-ময়-দুঃখময়ের সঙ্গম কোথায় ? অকি[illegible]আনন্দই সেই সঙ্গম।

আমি।—দান পথে ? আমি ত দান করিলাম ! এই যে সুখময় ও দুঃখময়ে বিচ্ছেদ, দানেই ত বিচ্ছে-দের সৃষ্টি !

যাহাকে দান করি কেন সে আমার মতন হয় না ? যাহা রাখি ও যাহা দিই, তাহাতে আনন্দের

কিছু তারতম্য আছে কি ? নতুবা যে দেয় ও যে দান গ্রহণ করে তাহাদের এ বিচ্ছেদ কেন ? যত বেশী দিই তত বেশী দিই না, অদেয়ই বাড়িয়া যায় ! দানেই এই বিচ্ছেদ—দান করিয়া ইহার শেষ করিবে কে ? গঙ্গা যমুনা সঙ্গমেও ভিন্নধারা কেন ?

* * * * * *

[ছায়াদৃশ্য ।

দুঃখময়।—(স্বগত) আমি দুঃখী, আমার ভিক্ষা আছে। আমি দান গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু দাতাকে পাইলাম কৈ ? দুঃখময়ত্ব ঘুচিয়া, সুখময়ের আবেশ হইল কৈ ?

এই যে আমার বিশ্বগোলক, আলোয় আঁধারে আমি এই গোলক লইয়াই খেলি। সেটাকেই ঘুরাইতে থাকি, কত ছলে, কত ভাবে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখি। তাহাতে আমার ছায়া লাগিয়া আছে, তাহার উপরে কত আকাশ-রং‌এর আভা

পড়িয়াছে, কত মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, কিন্তু কৈ তাহাতে সুখময়ের সন্দর্শন ত কখনও মেলে না। দেখিতে দেখিতে কোথা হতে কত সত্য, কত মিথ্যা, কত খেয়াল, কত অবিচার, ভাসিয়া আসিয়া এই আমার স্ফটিক বিশ্বগোলকে প্রতিবিম্বিত হয়। কত স্বপ্ন, কত অধ্যাস, এই আমার ছায়াকৃতির সহিত ছায়া হইয়া মিশিয়া যায়, ও তাহাকে দিনে দিনে বাড়াইয়া তুলে। এই আমার আগন্তুক ভেজাল, ইহা হইতে কি আমার মুক্তি নাই?

সুখময়।—(স্বগত) আমি ধনী। আমি সুখী। সেই সুখের উচ্ছ্বাসে আপন আবেগে আমি দান করি। আমি দান করিয়াছি। কিন্তু যাহা দিয়াছি তা কি স্মরণে আছে? আছে আছে, যে আমার দান নিয়েছে, তার কথা মনে আছে। সে কোথায়? সে কি আমায় মনে করে? আমার দান নিয়াও কি সে তাহার দৈন্য-দারিদ্র্য ভুলিতে পারিল না, সেই সত্য মিথ্যা, খেয়ালের খেলা, দূরে ফেলিয়া, সেই মলাধূলার কথা বিস্মৃত হইয়া, সুখের আবেগে আমার পানে ছুটিয়া আসিতে পারিল না? তাকে দেখি না কেন? কেন সে আসে না!

দুঃখময়।—(স্বগত) কে যেন আমায় ডেকেছে। আজ আমার দাতা কি আমায় স্মরণ করেছে! যে দান দিয়েছে তাহার দেশের সন্ধান আজ পেয়েছি। তাই আজ প্রভাতে জীবন-সাগরে তরণী বাহিয়া চলিয়াছি। আজ আমার মতন সুখী কে, আমার মতন ধনী কে! কত যুগ পূর্ব্বে যে রস পান করিয়াছিলাম তাহার স্বাদটি এখনও ভুলি নাই। সেই স্বাদটি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম তাই এই মর্ত্ত্যে আসিয়া জীবন-মরণের সাগর তিক্ত বা বিস্বাদ হয় নাই। আমার কাণ্ডারী আমার সাধের তরণী বাহিয়া সুখময়ের দেশে আমাকে ভাসাইয়া লইতেছেন। আর আমার নরদেহে অগণন বিলাস, আমার বিরাট সাঙ্গোপাঙ্গ, সবাই আমার সাথে আমার তরণীর পিছে পিছে, মিছিলে পাল তুলিয়া, আকাশের নীচে তরঙ্গকল্লোলে ভাসিয়া যাইতেছে। করুণ সঙ্গীতে, অরুণ আলোকে, সুখের সাগরে, ভাসিয়া চলিতেছি।

নিয়তি।—(স্বগত) একজন ছিল দুঃখী, একজন ছিল ধনী, একজন আপন ধন বিলাইয়া দুঃখী হইল,

একজন অপরের ধনে ধনী হইল, নিয়তিই নিয়ামক।]

* * * * * *

জ্ঞান।—কেন এত ভাব ? আমি দান নিয়াছি, আমি দান দিয়াছি। আমিই সুখময়, আমিই দুঃখময়।

আমি।—আর আমি ! আমি মাঝে থাকি। আমি যেন এক তুলাদণ্ডের দাঁড়, কখনও ভারে এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি, কখনও ওদিকে। সোজা কখনও হইতে পারিলাম না। স্থির থাকিতে পারি না।

জ্ঞান।—তাই সুখময় ও দুঃখময় ওজনে সমান হইতে পারিল না !

আমি।—কিন্তু আমি ত এদের সমান করাইবার জন্যই দাঁড় হইয়া এখানে আসিয়াছি। কিন্তু পারিলাম না কেন ? আর এও বুঝি, যে ইহারা পরস্পর পরস্পরকেই চায়, তবে যেখানে প্রেম সেখানে মিলন নাই কেন ? মিলন কাহাকে বলে ?

মন।—আমি জানি ! সমান জ্ঞান না হইলে মিলন হয় না। উভয়েরই এককালে "আমরা সমান" এই

জ্ঞান যদি হয়, তবেই মিলন হয়। নহিলে হয় ভক্তি, না হয় বাৎসল্য—তাহাতে মিলন নাই বুঝিয়াছি।

আমি।—এই দুঃখময়ের ও সুখময়ের কি সে জ্ঞান হয় নাই? কাহার হইয়াছে, কাহার হয় নাই?

জ্ঞান।—এ সুখময় ও দুঃখময় যে এক, সে জ্ঞান আমার হয়েছে। আমিই আজ জ্ঞানী।

আমি।—সে ত তুমি শুধু তোমার সৃষ্টির কথা, তোমার ধ্রুবলোকের কথা, বলিতেছ। তোমার সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিতে যে এক সুখময় ও এক দুঃখময় আছেন, তাঁহারা এক, এ জ্ঞান তোমার হইয়াছে জানি। কিন্তু অজ্ঞানের সৃষ্টি এই পরিণামী বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে এক সুখময় ও দুঃখময় আছেন তাঁহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? নিম্নে পাতাল, আর ঐ উপরে বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহাদের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সে ব্যবধান ঘুচিবে কেমনে, তাহার কথা ভাবিয়াছ কি? তুমি তোমার জ্ঞান লইয়া থাক, আমি কিন্তু আজ এই সুখময় ও দুঃখময়ের ব্যবধান কাটাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

হায়! সুখময় ও দুঃখময় আজ কাহার মুখ চাহিয়া, পরস্পর পরস্পরের কাঙ্গাল হইয়াও একজন স্বর্গে ও একজন মর্ত্ত্যে প্রতীক্ষা করিতেছেন। উভয়েই স্বাধীন ও শক্তিমান হইয়াও স্বস্বহৃদয়কে বঞ্চিত করিয়া কোন্ দুঃখের সেবা করিতেছেন? এমনতর প্রেম ত কোথাও দেখি নাই। ইহাতে ত দোঁহাদোঁহি ভাবের আবেশ দেখি না।

হৃদয়।—এই ত প্রেম। যে প্রেমের আবেশে একজন অপরের অধীন হয় বা অপরকে অধীন করে, যে প্রেম প্রেমপাত্রকে গ্রাস করিতে, আত্মসাৎ করিতে, চায়, সে ত কেবল ভোগের বিলাস, বাসনার বিকার। আর যদিই বা যুগলপ্রেম কামনাশূন্য হয়, তাহাতে আত্মবলিদান থাকে, এমন কি মুক্তিবাসনাও থাকে, তথাপি তাহা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর। যে প্রেমে সে ও তাহার বঁধু, একজন শুধু অপরের দর্পণস্বরূপ,—মাঝে তৃতীয় নাই, তাই বিম্বপ্রতিবিম্বলীলাও নাই,—হোক না কেন সে দর্পণ যতই স্বচ্ছ, যতই বৃহদায়তন, তাহাতে শিবসুন্দরের বিশ্বমূর্ত্তি প্রতি-

ভাসিত হয় না। যেখানে সে শুধু তার বঁধুর জন্য, ও বঁধু তার জন্য, সে প্রেম ত প্রেম নয়। যে প্রেম দ্বয়ে আবদ্ধ, যে প্রেমে তৃতীয়ের স্থান নাই, সে প্রেম ত প্রেম নয়। শুধু প্রকৃতি পুরুষে চলে না, আর একজন চাই। যে দম্পতীর প্রেমে সন্তানের স্থান নাই বা যাঁহারা সন্তানপালনে বিমুখ, যে ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্নেহ একই পিতামাতার প্রতি ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয় না, যে পরিবারের বন্ধনীতে সমাজের প্রতি শুভ আকাঙ্ক্ষা শিথিল করে, যে স্বদেশ-প্রীতি বিশ্বজনীন মানবপ্রীতির অনুগত নয়, যে আধুনিক প্রেমের সখের সেনা দুর্ব্বলের মুখ চাহিয়া সংস্কার ও শাসন মানিয়া চলে না, তাহারা ত স্বেচ্ছাচারী, তাহারা প্রেমের মহিমা জানিবে কেমনে? দুজনের প্রেমে একজন দেয়, এক-জন পায়, আর এই দেওয়া-পাওয়া পাওয়া-দেওয়ার ঘোরপাকে স্বার্থ যেদিক দিয়াই হউক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তৃতীয় যেখানে সেখানে উভয়েই সেই একের উদ্দেশে পর-স্পরকে নিবেদন করে। সে তার বঁধুকে

দেবতার ভোগে নিবেদন করে, আবার তার বঁধু তাকে। এই দেবতার জন্য প্রিয় বস্তুকে মানত করাই উৎসর্গ, আর এই উৎসর্গই জীবন, এই উৎসর্গই আনন্দ। সে প্রেমে আত্মবলিদান নাই কিন্তু উৎসর্গ আছে, সে প্রেমে দুঃখময় হয় ধনী, সুখময় হয় ভিখারী, সে প্রেমে ত্যাগই ভোগ ও ভোগই ত্যাগ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শুধু প্রকৃতি পুরুষে চলে না, আর একজন চাই।

আমি।—এখন দেখিতেছি আমিই এই তৃতীয়, আমিই ইঁহাদের একমাত্র বন্ধনী। ভগবানের আদেশে আমি এই সেতুবন্ধ হইয়াই থাকি।

জ্ঞান।—হাঁ বাঁধও বটে, বাধাও বটে। তোমার জন্যই ত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন নাই। তোমার জন্যই ত সুখময় ও দুঃখময় এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন।

আমি।—হায়! তবে আমিই ইঁহাদের মিলনে একমাত্র বাধা।

সুখময়-দুঃখময়।—(আকাশবাণী)—তুমি সন্ধিস্থল। এই যে নিয়তির বিধানে দুই সৈন্যদলে নিরন্তর

সংগ্রাম চলিতেছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা, চিৎ ও জড়, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও তমঃ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, দুই পক্ষেই ভগবৎশক্তি, নারায়ণী সেনা, এই যে নিয়তির অনাদি সংগ্রামে আমরা উভয়ে নিরন্তর শিবশান্তের অনুধ্যান করিতেছি, সেবা করিতেছি, তুমি না হইলে এ সংগ্রামে মধ্যস্থ হইত কে ? সন্ধিস্থল কোথায় ?

আমি।—(সচকিত) ভগবানের আদেশে আমি মাঝে এই দাঁড় হইয়াই থাকি।

সুখময় ও দুঃখময়।—(আকাশ হইতে) তুমি মাঝে না থাকিলে আমরা থাকি কোথায় ? কোন্ শূন্যে ? তুমি আমাদের রাখ। সৃষ্টির যত ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, আলো-আঁধার, জীবন-মরণ, তোমার অভাবে কোন্‌টা কি, এ বিচার করিয়া দিত কে ! তুমি বিচারক, তুমি তটস্থ। তুমি বিচার করিয়া এই দুইকে দুই দিকে রাখ। তোমার অভাবে আমাদের উভয়ের এই দ্বন্দ্ব, বৈকুণ্ঠে ও মর্ত্ত্যে এই দ্বিরূপ, এই যুগলবিগ্রহই হইত না, মিলন ত দূরের কথা। তুমি এই লোকদ্বয়ের বিধারক সেতু। হে জীব, তুমিই

লোকাশ্রয়, তুমিই লোকাধার। তুমি ইহলোক ও পরলোকের সেতুবন্ধ হইয়া যুগে যুগে রূপ ধারণ কর।

জ্ঞান।—(স্বগত) আজ প্রকৃতির ঋণপরিশোধের পালা! এযুগে সন্তান ঋণী নয়, পিতাই ঋণী! সন্তানেই পিতার পিতৃত্ব!

*   *   *   *   *   *

আমি।—(আক্ষেপোক্তি) আমি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মাঝে পড়িয়া গেলাম। ভগবান ও আমায় বুঝিলেন না, এই দুঃখ।

মন আমার, আর নয়, আর নয়। এস, এদিকে এস, আজ এখানেই, এই মধ্যপথেই, থাকি। তুমি এমন ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলে কেন? তুমি বড় উড়িতে ভালবাস, জানি। আজ তোমার আকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল বলে অমন ক্ষুণ্ণ হয়ে আছ? তবে আর উড়িবে কোথায় ভাবিতেছ, তবে আর বাঁচিবে কেমনে তাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছ? উঠ, ক্ষান্ত হও, আমি

তোমায় পথ বলিয়া দিব। এস, এদিকে এস, আর ওদিকে উড়িতে যেওনা। ও আকাশ যে শূন্যময়ের দেশ। ও শূন্যে একটিও ক্ষুদ্র নীড় বা আশ্রয় নাই যেখানে তুমি শ্রান্ত হলে দেহভার রাখিবে। ও সাগরে কূল কিনারা নাই। ও সাগরের পথে যে উড়ে, সে পাখী আর নীড়ের সন্ধান পায় না, আর ফিরে না। ও যে ভূমা, অনাদি অনন্ত পরব্যোম, সর্ব্বাতীত, তুরীয়। তোমার মতন ক্ষুদ্র পাখী ও আকাশে কি উড়িতে পারে। তাই বলি, এদিকে এস, দক্ষিণ পথ ছেড়ে আমার বামে এই আকাশে এস। চোখ্ খোল, দেখ, এ মাঝের আকাশও কত বড়। এ আকাশেই তোমার মুক্তি, এখানেই তুমি স্বাধীন। এখানেই তোমার উড়িবার অধিকার। দেখ, এ আকাশে তোমার মতন কত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। এ দিকে ঐ দেখ ঐ পাখীগুলি সবে ডিমের আবরণ ভেঙ্গে বাহির হয়েছে, দুখানি ছোট ছোট ডানাও ফুটেছে। আর আকাশ দেখে উড়িবার সাধও মনে জেগেছে। কিন্তু

ওদের মা নাই। ওদের মা ওদের জন্ম দিয়া কোথায় পলাইয়া গেছে! তাই আর উড়িতে শেখে নাই। এস আমরা ওদের উড়িতে শেখাই। আজ এই উড়িতে শেখানই আমাদের জীবন হউক। আজ আমি ইহাদের পলাতক মাতার স্থান জুড়িয়া থাকি।

এই শিক্ষার পথে চলিতে চলিতে যদি কেহ উঠে তবে আমিও উঠিব, যদি কেহ পড়ে তবে আমিও পড়িব, যদি কেহ উড়ে তবে আমিও উড়িব। আজ আমি এই অনাথদের সুখে দুঃখে, উৎসাহে অবসাদে, বিরামে গতিতে জীবনে মরণে, জীবন-দেবতার সেবাব্রত উদ্‌যাপন করি। দুঃখময় ভগবানের উদ্ধারের প্রতীক্ষায় আর বসিয়া থাকিব না।

২—সপত্নী

মায়াদেবী যোগমায়া

স্বামী

মন

বিশ্বেশ্বরী বিশ্বেশ্বর

(স্থান—মায়াপুরী। দূরে, বেলাভূমি।)

স্বামী।—দূরে ঐ বেলাভূমি। কৃষ্ণনীল আঁধার রাশিতে পশ্চিম গগন একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। ধীরে ধীরে ঐ ঘোর নীল কাটিয়া ফরসা হইয়া আসিতেছে। আকাশ ও সাগর যেখানে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে, ঠিক সেইখানে পশ্চিম দিক্ প্রান্তের শেষ অংশটুকু চাঁদ ও একটি অনুচর নক্ষত্র লইয়া ডুবিয়া গেল। আর ক্রমশঃ সেখানে একটি নীলাক্ত শুভ্রজ্যোতিরেখা দেখা দিল। এদিকে বেলাভূমিতে তরঙ্গসমূহ রত্নাকরের গর্ভ হইতে কখন মুক্তা কখন বা ঝিনুক আবার কখন কত আগাছা জঞ্জাল ও কলঙ্কচিহ্ন সেই পুণ্যসঙ্গমে অঞ্জলিপ্রদানে ছিটাইয়া

দিতেছে। উষার অস্ফুট আলোকে সমুদ্রের তীরে ঐ মন্দিরটি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সাদা হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কেবল মন্দিরের চূড়াটি অরুণালোকে যেন স্বর্ণমণ্ডিত, নীলাকাশ-পটে চিত্রিত। আকাশ ও নীল সাগরের মাঝখানে মেঘের অন্তরাল হইতে এক একটি শ্বেত কৃষ্ণ সামুদ্রিক চিল কেবলই একবার ঊর্দ্ধ হইতে অধোমুখে আরবার অধঃ হইতে ঊর্দ্ধমুখে আনাগোনা করিতেছে, কখন বা চক্র দিতে দিতে সাগরবক্ষে ঝাপটা মারিতেছে। হায়! আমিও যদি ঐ সামুদ্রিক পাখীর মত সমুদ্রের বাতাসে নিজকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম। তীরে নীড়ের খবর আর লইতাম না। ঐ সমুদ্রের মহিমায় আপনাকে ডুবাইয়া দিতাম। না না, সে সন্ধানে আমি আসি নাই। ঐ বেলাভূমিতে মন্দিরই আমার ভাল। সেই স্নিগ্ধ রূপ ক্ষণে ক্ষণে আমাকে স্বপ্নাবিষ্ট করিতেছে। সেই সৌম্যশান্তমূর্ত্তি মন্দিরবাসিনী যোগমায়া এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ধ্যানে নিরতা। সে যখন বীণা বাজাইতে বাজাইতে এই নগ-

রের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে, তখন বালকও ধূলা ছাড়িয়া ক্ষণেক তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, শোকাকুলা শোক পরিত্যাগ করিয়া মাটির শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, দুরাচার অত্যাচারীর উত্তোলিত হস্ত শক্তিশূন্য হয়, বিকারগ্রস্ত বিলাসীর অন্তরে প্রেমসঞ্চার হয়। এই রাজধানী মায়াপুরীর রাজপথ হাট-বাজারও তাহার সেই বীণার ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐ আবার সেই সুরটি তাহার বীণাযন্ত্রে বাজিতেছে। হায়! আমি যদি ঐ বীণার তার হইতে পারিতাম, তাহার সুরে আমিও বাজিয়া উঠিতাম। না না, আমি যে ভিন্ন তারে, অপর ডোরে, বাঁধা। সেই আমার শৈশবসহচরী সহধর্ম্মিণী কর্ম্মসচিবা মায়াদেবী, আমার জীবন ত তাহার কাছেই বন্ধক দিয়াছি। এক দৈব-মুহূর্ত্তে ভগবান আমাদের উভয়কে মায়াডোরে বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু মুক্তির পথ কি রাখেন নাই? মায়াতে আর আমার রুচি নাই। এই মায়ার হাত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে কে? মায়ার সহবাসে কেবলই উন্মাদ, তৃষ্ণার প্রতি

তৃষ্ণা, বিক্ষোভ। কিন্তু সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি, ভোগের পর পরিতৃপ্তি, চঞ্চলতার শান্তি, তাহাকে দিয়া পাই না। এতদিন বিকারহ্রদে মগ্ন হইয়া গরল পান করিয়াছি, আজ সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত। তাই আজ আমার প্রাণ সুধাপিয়াসী। কে আমায় সুধা দান করিবে ? সে কেবল পারে একজন, সে আমার সেই বেলাভূমিতে মন্দিরবাসিনী। যাই তার কাছেই যাই, যে আমার জীবনদায়িনী।

মন।—তুমি অমৃত চাও, বিকার হতে মুক্তি চাও, কিন্তু তোমার মায়াদেবীকে এই মায়া-কানন হতে মুক্তি না দিলে তুমি ত মুক্ত হবে না। মায়া-পুরীতে তুমিও আবদ্ধ থাক্‌বে। সর্ব্বাগ্রে মায়া-দেবীরই তোমার উপর যত অধিকার, যত দাবী। আর তোমাকেও তার দাস হয়ে তার ভোগ তৃষ্ণা মিটাইয়া তাকে নির্ব্বাণের পথে লইতে হবে।

স্বামী।—নির্ব্বাণের পথ ? সে ত ঐ সমুদ্রের দিকে।

মন।—ঐ সমুদ্রের স্রোতে তোমার মনটিকে যদি একবার

ভাসিতে দাও তবে সে কূলহারা হয়ে একেবারে অগাধ সাগরে ডুবে যাবে। তখন কি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তোমাকে সেই অতলস্পর্শ হতে চিনে নিতে পারবেন। আজন্মসঙ্গিনী মায়াকে এমন করে সংসারক্ষেত্রে চিরতরে অনাথা করে যেতে তোমার প্রাণে সইবে কি? সমুদ্রে অমৃত ও গরল উভয়ই উঠে। তোমার যাহা অমৃত, মায়ার তাহা গরল।

স্বামী।—মায়াও যে আমার কাছে গরল, আমি ত অমৃত চাই।

মন।—বেশ, কিন্তু অমৃত পেতে গিয়ে যদি অপরকে গরল আনিয়া দাও, তবে কোন্ দিকে যাবে? মায়া তোমাকে দিয়াই সুধার স্বাদ পায়। তোমাকে দিয়াই তাহার চরমে বন্ধনমোচন। তুমি যেমন যোগমায়াকে আপনার করিয়া লইতে চাও, মায়াও ঠিক সেই ভাবেই তোমাকে চায়। তুমি যোগমায়াকে, আর মায়া তোমাকে, একটি ক্ষুদ্র জীবকে। তবেই দেখ, সেই যে পিপাসা, সেটা এক, কেবল আধারবিশেষে পার্থক্য।

স্বামী।—এই যে বাসনা, একজনকে আপনার দ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা, এইটি যখন এক হইতে বহুতে, সীমা হইতে অসীমে, বিস্তৃত হইয়া যায়, তখনই ভগবানকে পাওয়া যায়।

মন।—মায়াও সেই পথের পথিক, তবে তাহার যাত্রা এই মাত্র সুরু হয়েছে। সে এই একের মোহে আবিষ্ট হয়ে একটি কালচক্র সৃজন করতে বসেছে। এই মোহ হইতে তাহাকে জাগাইবার জন্যই ভগবান মায়ার সংসারে জীবকে পাঠাইয়াছেন। মায়াকে তুমি ছাড়িলে তাঁর কার্য্য সিদ্ধি হবে না। জগতে অপরকে অভুক্ত রাখিয়া কেবল নিজের ক্ষুধা দূর করা কি অমৃতের পথ?

স্বামী।—আমি সে কথা জানি। তোমাকে বন্ধু বলে মানি। তুমি আমাকে সত্যের পথে লইয়া যাও। কিন্তু হায়! জগতের কি এই নিয়ম? একজনের ভোগে অপরে বঞ্চিত? একজনের সমৃদ্ধিতে অপরে দরিদ্র? একজনের ক্ষুধানিবারণে অপরে ক্ষুধিত? আর তাই বুঝি জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকে আকাশে সূর্য্যের স্থান নাই। বীজ-

সৃষ্টিতে ফুলের সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়ে। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে শীতকে পলাইতে হয়, আর সুখ দুঃখ একই কালে তিষ্ঠিতে পারে না। দুঃখ ত অভাবমাত্র নয়, সে ত সুখেরই পরভাব, আর সর্ব্বত্রই এই স্বভাব ও পরভাবে বিরোধ। শ্রেয়ে শ্রেয়েও এই বিরোধ, এই সংগ্রাম। আদর্শ ও বাস্তব যেন অন্তর ও বাহিরের ন্যায় একত্র থাকে না। সঙ্গতি কোথায়? আজীবন ত এই বিরোধ সংসারক্ষেত্রে দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে হিতাহিত, সত্যমিথ্যা, শ্রেয়ঃপ্রেয় মীমাংসায় অক্ষম হইয়া শক্তি হারাইয়া ফেলি। তখন, মন, তোমাকেই মন্দ বলি। কিন্তু আজ আমি মীমাংসা চাই। অপরের মনের উপর আমার কোন হাত নাই, কিন্তু নিজের মনে কেন একই কালে সুখদুঃখবোধে, ভোগ ও ত্যাগের অধিকারে, বিরোধ থাকিবে? আমি আজ বিরোধ-ভঞ্জন চাই।

মন।—কিন্তু মায়ার মনের বিরোধ তুমি কি ঘুচাইতে পার? তুমি কেবলই নিজের দিকটা দেখিতেছ।

স্বামী।—এই সুখদুঃখের মীমাংসা, এই বিরোধভঞ্জন,

নিজের নিজের উপর নির্ভর করে। কেহ কাহাকেও শান্তি আনিয়া দিতে পারে কি ? শান্তিকে আপনি অনুসন্ধান করিতে হয়, অন্য পন্থা নাই। আমার যাহা দেয়, তাহা আমি কড়ায় গণ্ডায় দিব। মায়াদেবী তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব আমাকে সমর্পণ করেছে। তাহার তালুর পিপাসা আমিই কেবল মেটাতে পারি, সে আমাকে তৃষ্ণা-নিবারণ দেবতা বলে জানে। আর আমি আমার যাহা কিছু দেবার আছে তাহাকে দিব। কিন্তু আমি জীব, আমারও জঠরে ক্ষুধা আছে, তালুতে পিপাসা আছে। সে ক্ষুধা ত মায়া দূর করিতে পারে না। সে পারে আমার সেই রাণী, অমৃতক্ষরণী, কিন্তু হায়! মায়া আর আমি এমনিই নিয়তির ডোরে বাঁধা যে যখনই আমার পিপাসা মেটাতে যাই, তখনই সে আর আমাকে পায় না। ভগবান এমন ডোরে জীব ও মায়াকে বাঁধিলেন কেন ? অবোধ মায়া বোঝে না যে আমার রসভাণ্ডার পূর্ণ না থাকিলে তাহার নীরসতায় সরসতা আনিয়া দিবে কে ?

মন।—মায়ার পিপাসা মেটে নাই বলে সে তোমাকে সুধা দিতে পারে না, তেমনি হে পিপাসাতুর, তোমারও পিপাসা ত এখনও দূর হয় নাই, তবে তুমিই বা কেমনে মায়াকে সুধা পান করাইবে। যে নিজের পিপাসার কথা বিস্মৃত না হয়, সে কখনই অপরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। তাই তুমি মায়াকে শান্তিবারি আনিয়া দিতে পার না। যে দোষে মায়াকে দোষী করিতেছ, তুমিও সেই দোষে দোষী।

স্বামী।—তবে কি মায়াকে তুষ্ট করাই আমার জীবন? আমি জগৎকে চাই। আর সব ভুলে গিয়ে শুধু মায়াতেই ত আমি জগৎ পাই না। আমি যে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্বের প্রাণ পাই না। সে বিশ্বরূপের অংশ বটে, কিন্তু সীমার গণ্ডীতেই তাহার প্রাণ, তাহার রূপ। মায়াকাননের অন্তঃপুরে তাহার ক্রীড়া, বিশ্বপতির দরবারে কখনও ঘোমটার আবরণ হতে নিজকে প্রকাশিত করে না। আর আমার সেই যে রাণী, সেও আকারে ক্ষুদ্র বটে, ক্ষুদ্র না হইলে আমার ক্ষুদ্র মনের আসনে তাহাকে বসাইতে পারিতাম না।

কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় যে সমগ্রকে ব্যাপিয়া আছে। তাহার হৃদয়ের গভীর প্রেম স্বপ্রকাশ হইয়া ফুটিয়া আছে। তাই সেই অনন্তরূপিণীই কেবল আমাকে বিশ্বপথে লইয়া যায়। সীমন্তিনী মায়াকে দিয়া আমার চলে না। মুক্তবেণী যোগমায়াকে চাই। আমি আজ সকলের ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে চাই।

মন।—ঠিক কথা। মায়াও ত সেই সকলেরই প্রতিনিধি। মায়ার সেই তৃষিত নয়ন, অভুক্ত জীর্ণ শীর্ণ বদনখানি কি বিশ্বমাঝারে ঘরে ঘরে দেখ নাই? মায়া ক্ষুদ্র! মায়া ব্যাপক নহে! এ জগতে এই মায়ারূপিণী মায়াই যে কত তাহা ত তুমি জান না! মায়া সেই সকল মায়ার শক্তিতে শক্তিশালি[illegible] তাহাদের অধিকারে অধিকারিণী। মায়াকে [illegible]দি তাহার সত্যরূপে দেখিতে, তবে মায়াকে তোমার ক্ষুদ্র মনে হইত না। মায়ার মায়াও যোগমায়ারই মতন জগৎকে বেষ্টন করে আছে। প্রতি প্রাণে, প্রতি বস্তুর ছাঁদে, এক একটি মায়ার রূপ। যোগমায়া ও মায়াকে যে একই ওজনে দেখে, সেই জগতের পূর্ণতার পরিমাণ পায়।

স্বামী।—কিন্তু কৈ আমি ত মায়ার রূপে সেই শান্ত সৌম্য প্রতিমার আভাস পাই না। তাহার প্রেমে যোগমায়ার আবেশ দেখি না। আমার মনে হয় যোগমায়া কেবল মায়াতেই প্রকাশিত নয়। তাই মায়ার প্রাণে এত জ্বালা, তাহার পিপাসায় এত শুষ্কতা। মায়া আপন অহঙ্কারে তাহাকে হারাইয়াছে ; এই আমার দুঃখ, সে যোগমায়াকে চায় না।

মন।—একদিন চাইবে। সত্যেতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সময় লাগে। কত তপস্যায় তোমার যোগমায়ার সন্দর্শন মিলেছে। আর আজও কি তাহার পূর্ণরূপ দেখেছ। তাহাকে যদি তুমি পেতে, তবে তোমার মন আজ এমন চঞ্চল হত না। অপূর্ণও চাই, নহিলে পূর্ণ হবে কে ? শুধু মায়াদেবী নয়, ভাবিয়া দেখ ত আজ কাননে সব কুসুমগুলিই কি বিকশিত, সকল মুক্তাই কি রাজার মাথার মণি, সকল তারাই কি শুকতারা, সকল শীষেই কি ধানের বীজ ? কিন্তু বিরাট স্বভাবদেহে ফুলে ফুলে, তারায় তারায়, মুক্তায় মুক্তায়, মিলন নাই, বাঁধন নাই, আপন

ইচ্ছায় ফুটিয়া উঠে ও ঝরিয়া পড়ে, উদিত হয় ও অস্ত যায়। সেখানে পরস্পরে রেষারেষিও নাই, মেশামিশিও নাই, তাই কাহাকেও কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। প্রত্যে-কেই নিজের সামর্থ্য ও স্বাতন্ত্র্য দিয়া নিজ ধারা অনুধাবন করিতেছে, আপনার স্বতন্ত্র সত্তায় আপনি পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু মানবের সম্বন্ধে তাহা নয়। মানবহৃদয় পরস্পর পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। মানবকে দিয়াই মানব পূর্ণকে পায়। তুমি ও মায়া সেই সম্বন্ধেই বদ্ধ। তুমি মায়ার সোপান স্বরূপ, তোমাকে দিয়াই একদিন মায়া পরম-পতিকে জানিতে শিখিবে।

স্বামী।—বুঝিলাম রূপই অরূপকে পাইবার সোপান, আ সেই অরূপকে পাইতে গেলে প্রত্যেকেরই একটি রূপ আবশ্যক। আমারও এইরূপ একটি সোপান চাই। কিন্তু সেই রূপকে যদি অনন্ত-রূপে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারি, তবে অরূপকে পাই কি করে? যোগমায়া সেই অনন্তরূপের খণ্ডরূপ। তাই যোগমায়াকে না পেলে ত অনন্তরূপকে পাওয়া যায় না। আর অরূপের

সন্ধানও মেলে না। তাই আমি এই যোগ-মায়াকে চাই। মায়া আমার সেই যোগমায়া-প্রাপ্তির বাধা। সে আমার সোপান হইতে পারে না। সোপানকে পাইতেও দেয় না। মায়ার প্রাণ আজও আমার ক্ষুদ্ররূপে আবদ্ধ, অনন্তরূপ কাহাকে বলে সে জানে না। যোগ-মায়া আমার অপেক্ষা করে না। আমি মায়ারই আছি। মায়ার যত দাবী, যত অধিকার, আমাতেই; আর আমিও মায়ার ভোগে ভাগ বসাই নাই। মায়াকে অভুক্ত রাখিয়া তাহার খাদ্য কাড়িয়া খাই নাই। মায়ার সকল প্রাপ্য আমি তাহাকে দিব। কিন্তু তাহার জন্য নিজের অন্তরাত্মাকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব কেন? যোগমায়া যে সুধাবর্ষণ করে তাহা পান করিব না কেন? আর মায়া ত সেই সুধাব প্রত্যাশী নয়। সে যদি চাহিত তবে তাহাকে তা ছেড়ে দিতাম।

মন।—এ জগতে পরস্পর পরস্পরের জন্য, পরস্পর পরস্পরের খাদ্য। এবং ক্ষুধাও সকল জঠরে। তোমার যাহা খাদ্য সকলের তাহা নয়। আবার

তুমিও কাহারও খাদ্য। আর সেই কারণেই তুমি যদি নিজের খাদ্যের অনুসন্ধানেই বেড়াও, আর কি করে অপরের খাদ্য যোগাইবে সে চেষ্টা না কর, তবে অন্যে ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবেই, তুমিও বঞ্চিত থাকিবে। তোমরা কেবল নিজের প্রাপ্য টুকুই বোঝ, কিন্তু পরের মুখ চাহিয়া ত কখনও থামিয়া যাও না! তোমার যেমন জগতের উপর একটা দাবী আছে, অপরেরও তেমনি তোমার উপর একটা দাবী আছে। আর সেই দাবীটুকু বজায় রাখিতে গেলে বড়কেই ছোটর মুখ চাহিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। যে দীন, যে ভোগে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পায় নাই, সে ত্যাগ করিবে কি? উৎসর্গের মহিমা জানিবে কেমনে? সেই জন্যই বড়কে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া পরের মুখের আস্বাদে, পরের মুখের তৃপ্তিতে, আপনার ভোগ্য-টুকু, আপনার প্রাপ্যটুকু, পাইতে হয়। তুমি তোমার প্রাপ্যটুকুই কেবল চাও, যাহা দেয় তাহা দিয়াছ কি? আনন্দ সকলেরই প্রাপ্য, শুধু তোমার নয়।

স্বামী।—মায়া আমাকে চায়, আমি তাহাকে দিই। কিন্তু সে দান গ্রহণ করিতে জানে না। আমার দান—সে যে আজ সকলের ভিতর দিয়া, কিন্তু সে ত সকলকে চায় না। তাই আমাকেও পায় না। আমার হৃদয় মায়ার মত একে আবদ্ধ নয়। তাই যতই সে আমাকে তাহার একলাকার করে বাঁধিয়া রাখিতে চায়, ততই তার বন্ধন শিথিল হইয়া আসে। হায়! মায়ার মত জ্ঞানান্ধ হইতে পারি না কেন? অথবা মায়া কেন জ্ঞান পায় না! সে যদি বড় হইয়া উঠে তবেইত আমাকে পায়। মায়া সে কৌশল শেখে নাই। কোমল হৃদয়ার স্বভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ, ও তাহার সহিত সংমিশ্রিত অসামর্থ্য দেখিলে আমার প্রাণ বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। হায়! ভগবান এমনতর উপাদানে মায়াকে গড়িলেন কেন? অথবা আমাকে মায়াময় করে সৃজন করিলেন না কেন?

মন।—তবে তুমি মায়াকে চাও। তাহলে যোগমায়াকে পরিত্যাগ কর, নহিলে যে মায়া শূন্য হয়ে যায়। ভূমানন্দের কথা ভুলে যাও। মায়াকে জীবন দান করেই আনন্দ লাভ কর।

স্বামী।—না না, আমি দুজনকেই চাই। সেই অমৃত প্রস্রবণ হইতে অমৃত পান না করি মায়ার পিপাসা মিটাইব কেমনে? বুঝিলাম মায়ার প্রাণও ক্ষুদ্র নয়, যোগমায়ারই মত বিশ্বব্যাপক। তবেই অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডারকে সহায় না করিলে আমি, ক্ষুদ্রজীব, মায়ার অনন্ত পিপাসা নিবারণ করি কেমনে? আমি উভয়কেই চাই।

আমি দিতে চাই তাই পেতেও চাই। না পেলে দেওয়া যায় না। তাই যোগমায়াকে পরিত্যাগ করলে আমি দিতেই পারব না। যোগমায়ার অক্ষয় ভাণ্ডার সদা পূর্ণ। আর আমি সেই ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী বলেইত মায়ার প্রতি আমার এত অনুরাগ। সে অমৃতধারা যদি একবার বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমিও মায়া উভয়েই বিনষ্ট হব। আমাদের জীবন তাহারই চিরযৌবনে, আমাদের প্রেম তাহারই অফুরন্ত প্রেমে। মায়া সেটা বোঝে না। সে ভাবে আমি রাজা, মায়া রাণী। কিন্তু আমাদের উপরে যে অধীশ্বরী আছেন, আমরা যে তাহারই, এ কথা সে জানে না। তাই যোগমায়াকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া

আমাকেই চায়। কিন্তু হায়! আমি যে সেই অধীশ্বরী যোগমায়ারই অঙ্গ, তাহার সহিত প্রাণে প্রাণে জড়িত, আমার সর্ব্বস্ব তাহার ঋণে আবদ্ধ। তাই মায়া পদে পদে আমার মন বুঝিয়া লয়। তাই তাহাতে আর আমাতে এ দ্বন্দ্ব। মায়া কেবল প্রাপ্যটুকুই বোঝে, সে কাহারও ধার ধারে না। তাই ঋণীর হৃদয়ের নম্রতা ও কৃতজ্ঞতার আবেগ উপলব্ধি করিতে পারে না।

মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়াদেবী।—তুমি তাহাকেই চাও। আমাতে আর তোমার রুচি নাই। মনে আছে সেই একদিন যে দিন তুমি বিশ্বেশ্বরীর রহস্যাগারে সেই আধ আলো আধ আঁধারে আমার জন্য, সৃষ্টির আদ্যা-নারীর জন্য, প্রতীক্ষা করে বসেছিলে। আমাকে না দেখে তোমার চক্ষুর দৃষ্টি ফোটে নাই। তোমার ঐ অন্ধ বাহু, ঐ উত্তপ্ত বক্ষ, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জানি নাথ! আজ আমাকে পেয়ে তোমার সেই

জ্বলন্ত বাসনা প্রশান্ত হয়েছে, জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে। অনন্তরূপ? এরূপ না দেখিলে অনন্তরূপ চিনিতে কেমনে? যে ক্ষুদ্রকে দিয়া অনন্তকে পাইয়াছ তাহাকেই পরিত্যাগ করে আজ অনন্ত পথের পথিক হইতে চাও? আমিও সেই অনন্তরূপের ভিতরেও অনন্তমায়া হইয়া থাকিব। দেখিব আমার প্রাপ্যটুকু না দিয়া, আমাকে দান না দিয়া, তুমি কি করে তোমার অনন্তকে পাও? যে দিন বিধাতা আমাদের অখণ্ড বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন, সেই মুহূর্ত্ত কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? আমি কিন্তু তাহা ভুলি নাই। সেই দিন থেকে আমি তোমারই চরণে আমাকে সমর্পণ করেছি। তোমাতে আমার শ্রান্তি নাই, অরুচি নাই, অস্পৃহা নাই, তোমা ছাড়া আর কাহাতেও আমার এ অনন্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। আর তুমি,— নারীর মর্য্যাদা ভুলে গেছ! অনারী যোগমায়াই তোমার হৃদয় ব্যাপিয়া আছে! সেই সর্ব্ব-গ্রাসিনী আমার জন্য তোমার হৃদয়কোণে এতটুকুও স্থান রাখেনি। সে শুধু আমাতে আর তোমাতে বিরোধ ঘটাইয়া ক্ষান্ত নয়, তোমাকে

একেবারে গ্রাস করে আমাকে বিধবা করতে চায়। আর তুমি তার ছলনায় মুগ্ধ হয়ে, বিবেকশূন্য হয়ে, তাহার দিকেই যাও, ও তাহার খাদ্য হয়ে তাহাকে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে দিতেছ। সে আর আমি? হায় ভগবান! কোন্ কৌশলে সে আমার স্বামীকে এমন করিয়া ভুলাইল? আমি তোমার চরণসেবার ব্রতী, আর সে তোমাকে তাহার দাস করিয়া লইয়াছে। ঐ যে তুমি দিন রাত বসে বসে তার আরাধনা করিতেছ, কিন্তু কৈ সে ত শুধু তোমাকেই চায় না। সে ঐ বীণার সুরে আরও কত জনকে এমনি ভাবে তার বন্দী করে রেখেছে, তাত তুমি জান না। আর আমার তুমিই সর্ব্বস্ব। সে যদি সকলকে তুষ্ট করে সময় পায় তবেই তোমার কাছে আসে, তোমার আরাধনায় তার অনুগ্রহদৃষ্টি পড়ে, একবার দেখা দেয়। আর সেও বা কতটকু কালের জন্য, একবার আসিয়া তখনইত আবার পলাইয়া যায়। তোমার সব অধিকার সব দাবী সব ইচ্ছা আমার উপর দিয়া চালাইয়াছিলে,

কে তাহার সহিত তাহা পার কি? হে সুধা-পিয়াসি, তুমি তাহার অনুগ্রহার্থী; কিন্তু তোমার যত স্বেচ্ছাচারিতা, যত অধিকার, যত প্রভুত্ব, তাহা আমাতেই। তেমনি আমারও—আমারও অধিকার তোমাতেই। আমি থাকিতে তুমি আর কাহারও নও। কেহ তোমার প্রভু নয়, তুমি কাহারও দাস নও। হে প্রভু! তুমি কি চাও বল। আমার সকল তুমি নাও। এই নয়ন, এই হস্ত, এই কুন্তল, এই বক্ষ, সকলই তোমার। আমার সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বান্তঃকরণ, তোমাকে দিয়াছি; এই নিয়া নিজের মনে নিজের ইচ্ছায় যে খেলা খেলিতে সাধ হয় খেল। আর যত প্রেম চাও তত প্রেম দিব, হৃদয়রক্ত নিঃশেষ করে শুদ্ধ প্রেম তোমার চরণে ঢালিয় দিব। হে দেব, হে সুধাপিয়াসি, হে ক্ষুধাতুর তাহাতেও কি তুমি পরিতৃপ্ত হবে না? আর তুমি যাহা দিতে চাও সকলই আমাতে অর্পণ কর। ধন বল, রাজ্য বল, সন্তানসম্পদ বল সব আমাতেই বিলাইয়া দিও। দেখো নাথ আমি সকলই যোগ্যভাবে ধারণ করিব। তু

আমার, আমি তোমার। এই তোমায় আমায় মিশাইয়াই আমাদের জগৎ। ইহার অতীত কোনও স্বপ্নলোকে তোমার স্থান কোথায়? সেই মায়াবিনীর জগৎ তোমার আমার নয়। এস প্রাণাধিক, ফিরে এস, আমার ঘরে ফিরে এস। আজ সে মকরধ্বজের মূর্ত্তিকে বিদায় দিয়া তোমার জন্য নূতন বসন্তের সৃজন করি।

স্বামী।—(স্বগত) সরলা বালার কি প্রেম! প্রাণাধিকে, আজ তোমার জন্যই তোমাকে বনবাসে দিব। হা নির্ম্মম নিঠুর! (প্রকাশ্যে) আমি ত তোমারই—তুমি আমায় বোঝ না। তোমার প্রতি আমার প্রেম কমা ছাড়া আরও দিনে দিনে বাড়িতেছে। তোমার বিচার করিবার শক্তি নাই। কিন্তু আমি আমার হৃদয়ের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিয়াছি, মায়া! তোমার ভারই বেশী। আজীবন তুমিই আমার সঙ্গিনী। আমার হৃদয় তোমাকে ছাড়ে নাই। যোগমায়া দান লইতে জানে না। আমি তোমার প্রেমের দাবী সকলই পূরণ করিব। তোমার পূরা

অধিকার তোমায় দিব। জ্ঞানেই তোমার অধিকার, অমৃতেই তোমার ঘর। একবার আমার ঘর ছাড়িয়া বিশ্বঘরণী হও। তখন বুঝিবে, প্রেম দিয়া প্রেমের, আনন্দ দিয়া আনন্দের, ঋণ পরিশোধ হয় না। সে ত প্রতিদান, প্রতিক্রিয়া, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জ্ঞানের মূল্যেই প্রেমের ঋণ, দুঃখের মূল্যেই আনন্দের ঋণ, শুধ্‌তে হয়। তোমার প্রেমের ঋণ শুধ্‌তে গিয়েই আজ তোমায় নির্ম্মম হয়ে প্রত্যাখ্যান করছি। তোমাকে পাইয়াই বিশ্বকে সুন্দর দেখিয়াছি, কিন্তু অসুন্দরকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। দুঃখময় ভগবানকে জানি নাই। আজ যোগমায়ার কৃপায় বিশ্বসংসারকে তার সত্য-মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি। সে সত্য আমায় স্বাধীন করেছে। কিন্তু মায়া! আমার সত্যে কি তোমার সত্য নাই, আমার মুক্তিতে কি তোমার মুক্তি নাই? তোমার মুক্তি না হলে আমারই বা মুক্তি কোথায়? কতদিন নিজের স্বাধীন আনন্দে স্বাধীন জ্ঞানে বিভোর হয়ে ছিলাম, তোমার অপেক্ষা করি নাই। কিন্তু আজ

প্রত্যুষে যোগমায়ার বীণার সুরে বুঝেছি, মায়া! তোমাকে বন্ধনমুক্ত না করলে আমার এই জ্ঞানই অজ্ঞান, আমার এই আনন্দও নিরানন্দ। মায়া, আজ আর তুমি আমার বন্ধন নও, আমিই তোমার সেই বন্ধন। আমাকে না ছাড়িলে তোমার মুক্তি কোথায়! তাই বলি মায়া! তুমি একবার আমাকে ভুলিয়া যাও, পরিত্যাগ কর। মহাতীর্থের উদ্দেশে একবার ঘরের বাহির হইয়া পড়। দেখিবে আমাকে ছেড়ে অপরকে দিতে গিয়ে বিশ্বকে পাবে। সেই বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব, যাহা তোমার সংসারেরই আশ্রয়ভূমি। মায়া! তুমি সেই বৃহত্তর সংসারের পথে দুঃখের সেবায় বাহির হইয়া পড়। আমাকে ছাড়িয়া দুঃখময়কে হৃদয়াসনে বসাও। দেখিবে হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে অংশে অংশে যতই বিলাইয়া দিবে, ততই সে হৃদয়ের প্রেম গভীর হইতে গভীরতর হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে। আর এই দুঃখসেবার পর যদি আবার কখনও তুমি ফিরে আস, তবেই সেদিন আমি যথার্থ তোমাকে পাব, তুমিও আমাকে পাবে।

মায়াদেবী।—তোমার মহামায়া সেই যোগমায়াকে লইয়াই তুমি তবে থাক। যাহার প্রেরণায় তুমি আমাকে নির্ব্বাসিত করিলে! কোথায় সে মায়াবিনী, যে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিল! হায়! এই পুরুষকে পাইবার জন্য কত ছল, কত কৌশল! কত যত্নভরে এই অঙ্গকান্তি, দেহের লাবণ্য, তাহারই জন্য রক্ষা করিয়াছি! আর আজ সে এই রূপ উপেক্ষা করিল! রূপ দিয়া জীবের মন ভুলান ত আমারই কাজ। আমি জীবের প্রাণে সেই রূপের মোহ জাগাইয়া দিই। যখনই জীবের হৃদয়ে বাসনার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঠিক সময় বুঝিয়া আমি সেইখানে আসিয়া অপেক্ষা করিয়াছি। মরুপথের যাত্রীর পিপাসার উদ্রেক হইলে মরীচিকা যেমন ছলনা করিয়া দূর হইতে আপনার বক্ষে টানিয়া লয়, আমিও তেমনি জীবকে টানিয়া লইয়া সেই সম্মোহন রস প্রদান করিয়াছি। কিন্তু হায়! আজ সেই জীবই আমায় উপেক্ষা করিল! ভগবান উপেক্ষা করেন তাহা প্রাণে সয়, জীবের উপেক্ষা প্রাণে সয় না! আমার সকলই বিফলে গেল।

হায়! আমিই এ সংসারের অধীশ্বরী ইহাই জানিতাম। আর একজন যে আমার রাজত্বে রাজ্ঞীপনা ফলাইতে পারে তাহা ত বুঝি নাই। কে সে, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে ভিখারিণী করিল! তবে আজ কেন আর এ রূপ, এ বিভ্রম, এ স্থিরযৌবন! কণ্ঠে কেন এ মণিমাল্য! শিরায় এ মুকুট! কেন আর এ মায়াকাননে আমার রম্য শ্বেতমর্ম্মর পুরী! আজ সব রসাতলে যাক্! আমার কৃষ্ণঘনকুন্তল যেমন আমার পৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া আছে, তেমনি নিবিড় আঁধাররাশি আজ ধরাকে ছাইয়া ফেলুক! আলো নিবে যাক্! আমার সঙ্গে সঙ্গে এই চিরনবীনা প্রকৃতি জরাগ্রস্তা, কঙ্কালময়ী, হোক্! জীবের কাছে জল হাওয়া মাটি সকলই বিস্বাদ হয়ে যাক্! আজ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার খালি হোক্! দেখি এ রূপের অভাবে, যৌবনের অভাবে, আমার অন্নের অভাবে, কে যোগমায়াকে লাভ করে! কেমনে সে যোগমায়া জীবের মন ভুলায়!

* * * * *

হায়! কেন আমি এ জগতে বঞ্চিত থাকিব! তাহার প্রাণের প্রেম-উদ্দীপক যে আমি। শিশুর মত তারে হাত ধরে কত হাবভাবে প্রেমের খেলা খেলতে শিখাইয়াছি! আমি না হলে যোগমায়াকে ভালবাসিতে শিখিত কেমনে? আর আজ সেই বলে যোগমায়া তাহাকে প্রেম শিখাইয়াছে! একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! আমার হাতের গড়া জিনিষ আজ অপরের ভোগে লাগিল। যোগমায়া রাক্ষসী!

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া।—শুনিবে আমি কিরূপ রাক্ষসী? তুমি তোমার স্বামীর প্রেমে-ভেজা প্রাণকে শুষ্ক করে নীরস করে ফেলে দিয়েছিলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দৈবক্রমে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলেই আজ তাঁর প্রাণে পুনঃ রসসঞ্চার হয়েছে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে তোমাদের পরিণয় নিয়তির অভিশাপে সর্ব্বনেশে হয়ে দাঁড়াত। তোমার স্বামীর প্রাণ আমার জন্য কাঁদে না। তোমার

স্বামীর প্রেম আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে আমার দরুণই তুমি তাহাকে ভোগ কর। তোমার স্বামীর জগতে তুমি আছ, আমি সেখানে নাই।

তোমার স্বামী দুঃখ কাহাকে বলে জানতেন না। জগতের একপার্শ্বে মায়াকাননের বিলাস-ভবনে তোমাকে নিয়েই তাঁর জীবন ছিল। সেই শ্বেতমর্ম্মরের পুরী। সোণার দালানে দালানে সোণার তোরণ, প্রত্যেক তোরণের উপর ময়ূর-বাহন মকরধ্বজের মূর্ত্তি। রঙ্গীন কাচের জানালা দিয়া ঘরে ঘরে মসৃণ মেজের উপর সেই মূর্ত্তির রঙ্গীন ছায়া পড়িত। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে পাথরে-বাঁধা কত মকর-আকারের ফোয়ারা, তার উপরে রামধনুর নৃত্য, আর নিম্নে স্বচ্ছ সলিলে আবার সেই মকরধ্বজের প্রতি-বিম্বহিল্লোল। সেই বিলাসভবনে কত চিত্রকক্ষ, কত মূর্ত্তিশালা, কত নাট্যমঞ্চ, কত ওস্তাদ গায়কের হিন্দোলমল্লার রাগিণীর ঝঙ্কার। এই বিলাসের আবেশে তোমার স্বামী কখনও দুঃখের বেদনা বা সমবেদনা কাহাকে বলে জানিতেন না

ক্রমে বিলাসিতার চূড়ান্তে আসিল আলস্য ও জড়তা, ক্রমে চিরশ্রান্তি ও কঠোর শুষ্কতা, ধীরে ধীরে জীবন্মৃত্যুর ছায়া। এমন সময় তোমার রাজধানী এই মায়াপুরীরই বাজার বস্তীতে একটি নারীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাঁহার সহিত আমার দেখা। সেই মুমূর্ষু নারী তাহার জীবন-বৃত্তান্ত আমার কাছে বলিতেছিল। তাহাতেই তোমার স্বামীর জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ। আমি মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যার পার্শ্বে যাই, ও তাহার হৃদয়ের ওজনটি হিসাবের তালিকায় টুকিয়া রাখি। সেই নারী বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাই তাহার জীবনকাহিনী কিছুমাত্র গোপনে না রাখিয়া আমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। সে যাহা বলিয়াছিল তাহা এই ঃ—

"আমি একটি শ্রমজীবীর কন্যা। আমার পিতা একটি কলে কাজ করিতেন। কিন্তু ভাগ্য-দোষে তাঁহার হাতখানি কলে কাটিয়া যাওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইলেন। তাহার পর আমার মাতা অনেক চেষ্টা করিয়া একটি ব্যবসায়ীর দোকানে কাজ লইলেন। কিন্তু দেশে যুদ্ধ উপস্থিত

হওয়ায় দোকানের মালিক তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিলেন। আমার বড় ভাই সৈনিক ছিলেন, যুদ্ধে হত হইলেন। আমরা ভাই বোনে অনেকগুলি ছিলাম। পিতা মাতা উভয়ে অকর্ম্মণ্য হইলে আমাদের গৃহে যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল তাহা নিঃশেষ হইল। অবশেষে আমার একটি রুগ্ন ভ্রাতা পথ্য ও ঔষধের অভাবে মারা গেল, ও আমার দুগ্ধপোষ্য ছোট বোনটিও দুগ্ধের অভাবে প্রায় নির্জীব হইয়া পড়িল। আমি বড় মেয়ে ছিলাম, শৈশবেই বিধবা হইয়াছিলাম। অনেকবার কাজের চেষ্টা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার রূপই আমার বালাই হইল। কোন গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। পিতা ক্রমে নেশা ধরিলেন। একদিন মত্তাবস্থায় আসিয়া দেখিলেন ঘরে খাবার নাই। আমার শিশু বোনটি অনাহারে চীৎকার করিতেছে। তখন তিনি আমার মাকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। আমি পাগলের মতন রাস্তায় ছুটিয়া গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় এক প্রৌঢ়বয়স্ক

পুরুষ আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ও আমার পরিবার পোষণের খরচ যোগাইতে চাহিলেন। আমি উন্মাদিনীর ন্যায় তাহাতেই রাজী হইলাম। তাহার পর আমার উপর অনেক ঝঞ্ঝাবাত গিয়াছে। আমি অক্ষম মা বাপ ও শিশু ভাই-বোনদের প্রতিপালনের কিনারা করিতে গিয়া কত পাশব অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছি তাহা আমার এই পৃষ্ঠদেশ ও কপোলের ক্ষতচিহ্নই সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানেই আমি এই পথ ত্যাগ করিতে পারি নাই, আত্মহত্যা করিতে গিয়াও থামিয়া গিয়াছি। সেবার জন্য যে দেহ বন্ধকী তাহার ভোগে বা ত্যাগে আমার হাত কি? ভগবান্ কাহারও নিকট ধনপ্রাণ, কাহারও নিকট সন্তান, চাহিয়া লন, কাহারও বা লজ্জা ভয় মান হরণ করেন, আমার নিকট প্রভু চাহিলেন দেহের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার। তাঁহাকে আমি তাহাই উৎসর্গ করিলাম। বাপ মা ভাই বোনের ক্ষুধার জ্বালা—সেই জ্বালারূপেই ভগবান আমার গৃহে নিত্য জ্বলিতেন। সেই আগুনেই নিজ

দেহের শুদ্ধি অশুদ্ধি সকলই আহুতি দিলাম। আমি ভাবিতাম দেহ দেহের কাজ করুক,—মনটি ত আমার, সে কাহারও দাস নয়। কিন্তু ভগবান সে অহঙ্কারও রাখিলেন না। একদিন আমার সহিত একটি যুবকের দেখা হয়। সে ও আমারই মত সংসারের দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে সেই জ্বালার হাত হইতে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ নিষ্কৃতি পাইবে এই আশায় মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুরা পরিত্যাগ করাইব এই আশাতেই তাহার প্রতি আমি প্রথমে আকৃষ্ট হই। ক্রমে না বুঝিয়া তাহাকে ভালবাসিতে শিখিলাম,—এতদিন আমি প্রেম কাহাকে বলে জানিতাম না। এক-দিন সে মত্তাবস্থায় আমার গৃহে আসিল। চারিচক্ষের মিলনে শিহরিয়া উঠিলাম, যেন বিজলীর চমকে দেখিলাম, আজ আমার ঘরে ঠাকুর নাই, সেবাদাসী নাই, আছে নারী, লজ্জাবতী, বিবশা, কিন্তু লজ্জানিবারণ নাই। সেই মুহূর্ত্তে বুঝিলাম নারীর মর্য্যাদা, নারীর মান! বুঝি-লাম আমি বারনারী বই কিছু নই! কিন্তু হা

ভগবান! যাহাকে হৃদয় দিয়াছি সেও আমাকে বারনারীর বেশী সম্মান দিল না। আমি সেই দিনের জন্য অন্ততঃ সতী সাধ্বী। প্রেমই যে নারীকে সতী করে, তাই সতীর তেজে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তখন সেই যুবক "এক বারনারীর হাতে অপমানিত হইলাম" এই জ্ঞানে ক্রোধে অধীর হইয়া আমার কণ্ঠে অস্ত্র-প্রহার করিল। তাহাতেই আজ আমার মৃত্যু। পুলিশের তলবের সময় আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছি এই কথা বলিয়াছি। আমি চলিলাম। দুনিয়ার মালিক আমার সেবা গ্রহণ করিলেন না, আমি যে দ্বিচারিণী হইয়াছিলাম, সেই যুবকের ভজনা করিয়াছিলাম"—এই কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিল—"মা আগেই গিয়াছেন। পিতৃগৃহে এখন রহিলেন বৃদ্ধ পিতা, নিঃস্ব, পঙ্গু, চখে দেখেন না। আর আমার সেই ছোট বোনটি, যাহার দুগ্ধের মূল্যে আমার জীবন............ সে এখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, অরক্ষিতা—আমার রূপের উত্তরাধিকারিণী হইবে বটে।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অন্ধ···কা···র”—চক্ষু মুদিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িল, পরক্ষণেই স্বপ্নাবেশে যেন কোন বিভীষিকা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—“রক্ত! রক্ত! ভোগমন্দিরে আজ নূতন বলি! যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত! করালি! আমার রক্তপানে তৃপ্ত হইলি নি!” এই বলিতে বলিতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিল, আর শ্বাস চিরতরে রুদ্ধ হইল।

তোমার স্বামী সকলই শুনিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তিনি দুঃখের সংসারকে চিনিলেন। বুঝিলেন একদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, দরিদ্রতা, মৃত্যুর করালগ্রাস, আর অপরদিকে নানাপ্রকার বিকারের জ্বালা ও উৎপীড়ন। বুঝিলেন ইহার সহিত পরিচয় না হইলে জীবনের সহিতই পরিচয় হয় না। এই সংসার হইতে প্রাণীকে উদ্ধার করিবার প্রেরণাই প্রেম, আর এই প্রেমেই মুক্তি। বুঝিলেন এই বারনারী আজ মুক্তাত্মা, আর তাঁহার নিজের বিলাসের গৃহই কলুষিত। বুঝিলেন এ নারী দেহকে দেহ বলে জেনে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে দেহদানে সেবা-

ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল, আর অন্তিমে নিজেরই রক্ত দিয়া দেহের শোধন করেছিল! বুঝিলেন বিলাস হইতে মুক্তি বৈরাগ্যে নয়, সে যে বিলাসেরই প্রচ্ছন্ন রূপ। বিলাসের মুক্তি দুঃখময়ের সেবায়। তাই এই সেবাব্রত লয়ে কঠিন সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং এই সাধনার পথে চলিতে চলিতে তিনি দুঃখময়কে জানিতে শিখিলেন। অবশেষে এই দুঃখের উদ্ধারের নিমিত্ত কত হাহুতাশ কত অবসাদ কত অসামর্থ্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানকে পাইলেন। চতুর্দ্দিকে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, জগতের প্রাণী দুঃখসাগরে মগ্ন। আর এই দুঃখদারিদ্র্যের তাড়নায় কাহাতেও অনাচার, কাহাতেও সমাজ-দ্রোহ, কাহাতেও অসত্য,—কেহ বা স্বার্থান্ধ অপরে শঠ, কেহ বা ক্রোধ ঈর্ষা হিংসা প্রতিহিংসা প্রভৃতি দুষ্টপ্রবৃত্তির দাস। এইরূপ নানাপ্রকার বিকার দেখিলেন। তবুও তিনি এই বিকার-গ্রস্তদিগকে, এই সংসারের ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত জীবদিগকে, বিলাসপ্রিয় আপন আপন সুখে উন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা কম শোচনীয় মনে

করিলেন। কারণ বিলাসী, কল্পিত সুখসাগরে মগ্ন হইয়া, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, হিতাহিত, অভাব ও পূর্ণতা, এ সকল প্রকার দ্বন্দ্বজ্ঞান হইতেই বঞ্চিত। বরং ঐ বিকারগ্রস্ত দুঃখ-সাগরমগ্ন ব্যক্তিরা দুঃখের তাড়নায় সুখকে, তৃষ্ণার তাড়নায় পিপাসানিবারণকে, জানিতে শিখিয়াছে। এই সব দেখিয়া তিনি আপনাকে জগতের দুঃখে ডুবাইয়া দিলেন, কিন্তু সে অতল-স্পর্শে তল পাইলেন না। একদিকে এই বিশাল মানবজাতির ভাগ্যবিধান, এই সমাজ-ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে শান্তিস্থাপন, আর অপরদিকে তোমার প্রেম, সংসারের মায়া। সত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার এখন পারিবারিক বন্ধনে কত অসত্যবোধ আসিল, আর প্রতি যুগলেও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়াদেবীকে দেখিলেন। এখন পূর্ণ জগতকে তাহার সত্য-মূর্ত্তিতে দেখিয়া তিনি স্বাধীনতা লাভ করিলেন। তিনি আজ জ্ঞানে যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা অনুভব করিতেছেন, সে ত আর কেহ পায় নাই। বিলাসীর বিলাসে সে স্বাধীন

আনন্দ নাই, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধানিবৃত্তিতে সে স্বাধীন আনন্দ নাই। তিনি যে জ্ঞানের অধিকারী, সে জ্ঞান জগতে কেহ ভজনা করে না। কিন্তু যে জ্ঞান আনন্দাত্মক তাহা ত কখন একাকী সিদ্ধ হয় না। জ্ঞান চায় নিজেকে বিলাইয়া অপরের জ্ঞানে নিজেকে জানিতে। তাই জ্ঞান প্রেম বিনা আত্মজ্ঞানে পৌঁছে না। প্রেমও জ্ঞান বিনা দাস্য হইতে আত্মরতিতে পৌঁছে না। ইহাই জ্ঞানমূলক প্রেম, ইহাই প্রেমমূলক জ্ঞান, ইহাই জ্ঞানানন্দ। তাই মায়া! তোমারও এই জ্ঞানমূলক প্রেম না হইলে তোমার স্বামীর মুক্তি নাই। তোমায় এই জ্ঞান, এই আনন্দ, ভজনা করিতে হইবে, তবেই তুমি স্বাধীনতা পাইবে, আর তখনই তোমার স্বামীও মুক্তি পাইবেন।

মায়াদেবী।—আনন্দ? আমার স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসায় কি আনন্দ তুই কি জানিস? নারী না হলে, সংসারের গৃহিণী না হলে, জানিবি কেমনে? মুক্তি? আমার বন্ধনে বাঁধা থাকলেই তাঁর মুক্তি। একেবারে সব মায়াবন্ধন কাটিয়ে

মায়ার সংসার ছেড়ে বাহির হলে মুক্তি কোথায় ? তাতে কেবল দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যায়, লাঘব হয় না। এই সংসারক্ষেত্রই কর্ম্মক্ষেত্র, এই সংসারপ্রবাহেই মুক্তিস্নান। আর এই মায়ার সংসারে মায়ারই যত অধিকার। মায়ার স্বামী মায়ারই—তাঁহার শরীর মন আত্মা, শক্তি রাজ্য সম্পদ, সকলই মায়ার, সকলই আমার, আর আমাতেই তিনি মুক্ত ও স্বাধীন। বন্ধনের ভিতর স্বাধীন থাকাই স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতার হাত হতে মুক্তিই মুক্তি। তাই জগতে প্রত্যে-কেরই একটি শৃঙ্খল থাকা চাই। অপরের তাহার উপর একটি অলঙ্ঘনীয় দাবী থাকা চাই। আমার স্বামীর উপর যে আমার দাবী, তাহা আমার বৈধ অধিকার। তুমি সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে আমার স্বামীকে যে আমা হতে বিচ্ছিন্ন করে সংসারের বাহিরে কোথায় কোন্ শূন্যে লইয়া যাইতেছ, সে কলুষ তোমাকেই স্পর্শ করে তোমাকে কলঙ্কিনী করবে। অলঙ্ঘনীয়কে লঙ্ঘন করা প্রেম নহে, ব্যভিচার, বিলাসিতার চূড়ান্ত। যোগমায়ার

বিলাস সে এক মায়াবিনীর যাদু, অমোহের মোহ। আমার বিলাস, সে ত সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র।

যোগমায়া।—আমি তোমার স্বামীকে তোমার অধিকার হইতে চ্যুত করি নাই। তোমার স্বামী তোমার, কিন্তু তোমার স্বামীর আত্মার উপর তোমার একার শুধু অধিকার নয়। আত্মা স্বাধীন, তাই একই আত্মার অনেক সম্বন্ধ, অনেক দ্বন্দ্ব। এক আধারে নানারসের অভিব্যক্তি, নানা আধারেও একরসের অভিব্যক্তি। তবে দেহটি এক-জনের, তোমার স্বামীর আত্মা বিশ্বাত্মার। তুমিও তোমার আত্মাকে এই পথে লইয়া যাও। তবেই মিলন, তাহা না হইলে বিরোধ। তোমার স্বামী আজ বিশ্বমানবের স্বামী, তুমিও আজ বিশ্ব-মানবের পত্নী হও। তোমরা এই জীবন-সংসারে শ্রেষ্ঠ দম্পতীর স্থান অধিকার কর। ইহা অপেক্ষা কোন সঙ্কীর্ণ অধিকার ত তোমার নয়।

মায়াদেবী।—বেশ কথা, কিন্তু তুমি একবার এখান হতে সরে পড় ত। সংসারক্ষেত্রে আমার অধিকার। তুমি এখানে কেন ?

যোগমায়া।—আমি ত সংসারের কেহ নই। আমি কেবল বসন্ত বাতাসের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই। এই বীণা বাজাইয়া বাজাইয়া প্রতি প্রাণে প্রেম জাগাইয়া তুলি। আমি কাহারও বৈধ অধিকারে ভাগ বসাইতে আসি নাই। কিন্তু মুমুক্ষু আত্মা আমার বীণার করুণ স্বরে বিশ্বের ডাক, অনন্ত সাগরের রোল, শুনিতে পায়। আমার বীণার স্বরে সেই সাগরের অমৃত আছে, তোমার স্বামী সেই সুধার স্বাদ পেয়েছেন বলেই তিনি আমার এত অনুগত। এই অমৃত পান করিয়াই তিনি জগৎকে অমৃত প্রদান করেন, আর মায়া! তুমি সেই অমৃত সর্ব্বাগ্রে ভোগ কর। কিন্তু তুমি নিজের স্বত্ব বোধে, অধিকার জ্ঞানে, সেই অমৃত ভোগ করিতে চাও বলেই অমৃতের বদলে গরল পান কর। দেবতার দান প্রসাদ বলে, মাথা পেতে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে, নিতে হয়। ঋণীর নম্রতা হৃদয়ে বোধ করিতে হয়। তুমি আপন অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অধিকারবোধে দেবতার দান গ্রহণ করিতে চাও বলিয়াই তোমার এই অমৃতের প্রতি এত অবিশ্বাস, এত সংশয়। তুমি যে ঋণদায়গ্রস্ত,

সে কথা জাননা। একবার অহঙ্কার ছেড়ে ঋণী বোধে আপনাকে বিকাইয়া দাও।

মায়াদেবী।—অহঙ্কার? অহঙ্কার কার? মায়ার না যোগমায়ার? জ্ঞানের না অজ্ঞানের? তোমার মত আমার জ্ঞান হয় নাই, সত্য। ঋণ পরিশোধ করি এই জ্ঞানে জীবনদাতার চরণে জীবন নিবেদন করি না। আপনার জ্ঞানে সকল জীবকে গ্রাস করিতেও চাই না। তবে আমি অজ্ঞানে আমার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছি। অজ্ঞানে বিতরণ করাই আমার কর্ম্ম। এই অজ্ঞানে বিতরণই আমার প্রকৃতি রাজ্যের সকল পদার্থে, সকল প্রাণীতে। ফুলে ফুলে চুম্বন, তারায় তারায় কথা, মেঘে মেঘে আগ্নেয় সংস্পর্শ, তাপ ও শীতের সমাবেশ, নদী ও সাগরের সঙ্গম, বিহগ বিহগীর কূজন, মৃগ মৃগীর কম্পিত রুত, প্রাণীতে প্রাণীতে স্বাভাবিক মমতার টান, সকলই অজ্ঞানের মহিমা। আর মানবহৃদয়েও আদিতে অজ্ঞানের মহিমাই বিরাজ করে। সে শৈশবে আপনহারা হয়ে নিজেকে দেয় ও পায়। তাই তার সে ভোগে পাপ স্পর্শে না। সে

ভোগে কেহ বঞ্চিত নয়। আমিই সেই অজ্ঞান-রূপিণী মায়া। প্রাণীতে প্রাণীতে থাকি। তাহাদের সুখের সংসারে সোণার স্বপনে বিভোর করিয়া রাখি। আর জ্ঞানী তুমি, তুমি আসিয়াই কত জন্ম মৃত্যুর ঘোর, কত বিরহবেদনা, কত বিকারের জ্বালা, আনিয়া দাও। তোমার আবির্ভাবেই জগতে যত অভাব, যত অসত্য, যত অশান্তি। অহঙ্কারী তুই, অজ্ঞানের মহিমা বুঝবি কেমন করে? আমার সোণার সংসারের সোণার স্বপন ভাঙ্গিস্‌নে। এখান হতে সরে যা।

যোগমায়া।—অজ্ঞানের দান বড়, সে কথা স্বীকার করি। অজ্ঞানের দানেই ত স্বপ্রকাশ হওয়া যায়। কিন্তু তুমি যাহাকে অজ্ঞানের দান বল্‌ছ, তাহা ত দান নয়, তাহা গ্রহণ, দাতার দান অজ্ঞানে গ্রহণ করা। তুমি অজ্ঞানে নিতেছ বলেই তোমার ঋণ বোধ নাই। আর জ্ঞানের মূল্যে যে প্রেমের ঋণ পরিশোধ করতে হয়, তাহা তুমি বোঝ না। তুমি যে অবস্থাতে বিশ্বেশ্বরীর প্রেম নিয়েছ ঠিক সেই স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছ। কিন্তু এক-বার জ্ঞানে পেয়ে সেই প্রেমকে শুদ্ধ করতে

হয়। এই জ্ঞানাগ্নিতে শোধন করাই প্রেমের ঋণ শোধা। শোধন ছাড়া অন্য শোধ নাই। প্রেমময়ী বিশ্বেশ্বরীর প্রেমেও একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। আর দান করবার সময় তিনি সেই স্বাভাবিক অংশটুকুই দেন, কিন্তু নিবৃত্তি-সাধনে সেই প্রেম জ্ঞানে শুদ্ধ করে জীবকে দুঃখের সেবায় বিশ্বপথে প্রয়াণ করতে হয়। বিশ্বেশ্বরী সেই পথে তোমার দানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তোমার স্বামীর প্রেম আজ সেই জ্ঞানাগ্নিতেই শুদ্ধ হয়েছে। যে অজ্ঞান জ্ঞানের চেয়ে বড়, জ্ঞানের চরমে, সেই অজ্ঞানে তুমি দান করতে শেখ নাই। তাহলে তোমার এই অধিকারবোধ থাকৃত না। দেখ প্রকৃতিরাজ্যে অধিকারবোধ নাই। সেখানে স্বত্ব স্বামিত্ব নাই। প্রকৃতি যে অজ্ঞানের মায়া, আদ্যা মায়া, চির প্রবীণা, চিরনবীনা। দ্বন্দ্বাতীতা, সীমাতীতা। কিন্তু তুমি ও আমি যাহাদের বিলাস, সেই সংসারের মায়া ও যোগমায়া, উভয়েই সীমাবদ্ধা, সেই আদিমাতৃকার ক্রোড়ে আশ্রিতা।

মায়াদেবী।—শুদ্ধ? স্বামীর প্রেম আজ জ্ঞানপথে শুদ্ধ

হয়েছে ? তবে অশুদ্ধ কাহাকে বলে ? আমিই শুদ্ধ হৃদয়ে একের ভজনা করিতেছি। ভগবান ও এক, আর একেকে দিয়াই ভগবানকে পাইতে হয়। আমি আমার স্বামীতে ভগবানের রূপ দেখি, তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারি। তোর মত সংসারে সংসারে হৃদয়ে হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া সাধনায় সিদ্ধ হতে চাই না। সকলের উপর আধিপত্য করা কি আরও বড় প্রবৃত্তি নয় ? কামনা নয় ?

যোগমায়া।—আমি সকলেই আছি, সকলকেই জানি। কিন্তু অপরে আমায় জানে না। আমার কোন কামনা নাই, ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, আধিপত্যের বাসনা নাই। তোমার মত আমার কাহাতেও বৈধ অধিকার নাই। সেই কারণেই কেহ না চাহিলে আমাকে পায় না। কিন্তু চাহিলেই পায়। যে আমাকে ভজনা করে আমি তাহা-কেই ভজনা করি।

নাহি মানা সমীপে আমার, নাহি বাধ,
তৃপ্তি বোধ নাহি মোর, নাহি অবসাদ।

আমি কাহারও জায়া নহি, কাহারও সহধর্ম্মিণী নহি। আমি বিশ্বনারী, বিশ্বদলবাসিনী, বিশ্বরূপবিলাসিনী। আত্মদানে আমার শ্রান্তি নাই, অরুচি নাই, অস্পৃহা নাই। আমাকে যাহারা অধীশ্বরী বলে জানে, আমি তাহাদের দাসী, সেবিকা।

আমার আধিপত্য? শুনিবে আমার রাজ্যের কথা? আমার প্রজা কারা? সেই বারনারী আমার প্রজা। এই মায়াপুরীর হাটে ঘাটে বাজারে বস্তীতে তোমার প্রজার মধ্যে ভার বহন করিতে করিতে যাহার পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া, পায়ের কব্‌জি, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার বুকের কলিজা দগ্ধ হইয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে, যাহার চখের আলো তামস আঁধারে চিরতরে নিবিয়া গিয়াছে, তারা সবাই আমার রাজ্যে স্থান পায়। আমার রাজ্য সে এক অন্ধপুরী, সে ত মায়াপুরী নয়। সেই আঁধারে বীণা বাজাইতে থাকি। তখন বীণার সুরে সেই আঁধারে জ্যোতির্ম্ময় ভুবন ফুটিয়া উঠে।

মায়াদেবী।—কিন্তু তুমি কে? এ বীণা কোথায় পাইলে?

তুমি কি বাপু আমারই মত একজন মানবী ছিলে ? যদিও আমার মত রূপ নাই, মন ভোলাইবার ত কোন মোহিনী শক্তি নাই ! এই নিয়েই তোর এত স্পর্দ্ধা ! আমার সোণার সংসারকে শুদ্ধ করবার তোর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। সংসারের নস্ ত সংসারে সংসারে, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াস্ কেন ? ভোগ কামনা নাই ত সকলকে নিজের ভক্ত উপাসক করতে সাধ কেন ? সকলে যে তোর শরণ লইবে এতটুকু অহঙ্কার ত বেশ আছে। বল্ দেখিনি কে তুই ? আমারিই মতন কি একজন মানবী ? না না, বুঝি মহামায়া তুমি, ভবানী ভবতারিণী, আমার থেকে আরো ঘোর সংসারিণী ! আমি শুধু একজনকে চাই, একজনই আমার ভোগের সহায়, আর বাকী জগৎ বাকী জগৎকেই ভোগ করিতে দিই। আর তুই সর্ব্বগ্রাসিনী, শতদলবাসিনি ! বিশ্বদলহাসিনি ! সকলকে নিজের করে নিতে চাস্। এই তোতে আর আমাতে প্রভেদ ! তোর যেথায় খুসী যা, আমার ঘরে তোর আসবার কিছু মাত্র দরকার নাই। আমার প্রেম

যেমন আছে তেমনি থাক, স্বভাবকে শুদ্ধ কর-
বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অজ্ঞানেই শিশুর
মহিমা, ধূলা খেলা লইয়াই সে পবিত্র।

যোগমায়া।—মায়া! তোমাকেও একদিন আমারই মত
ঘোমটার আবরণ হতে বাহির হয়ে বিশ্বপথে
দাঁড়াতে হবে। সকল অতিথি অভ্যাগতের সেবা
করতে হবে। শুধু একজনের ভিতর দিয়া যে
জীবন, সে জীবন নয়, জীবন্মৃত্যুর কারাগার,—
যে দেওয়া পাওয়ায় শুধু একজনেরই অধিকার,
সে অধিকার নয়, ক্রীতদাসের শৃঙ্খল। ভূমাতেই
তোমার অধিকার, ক্ষুদ্রজীবে নয়। তোমার
দাবী জগতের কাছে; তোমার দেয় যাহা,
তাহাও জগতের। স্বামীকে গ্রাস না করে এক-
বার জগৎকে গ্রাস করিতে শেখ দেখি। তোমার
স্বামীও যে জগতেরই অংশ, তাই জগৎকে
আপন কর, বিশ্বমানবকে পতিত্বে বরণ কর।
তোমার স্বামী, তিনি যে বিশ্বমানবের বিলাস।
তুমি বিশ্বমানবী হও, বিশ্বমানব তোমাকে ভজনা
করুক। আমিও একদিন তোমারই মত কোন
সংসারের মায়া ছিলাম, আমারও ঘরে বসন্তসখা

এসেছিল। বিশ্বেশ্বরের যোগমায়া আমায় ডাকিয়া লইলেন, তাই আজ আমি বিশ্বপথে যোগমায়া! তাই আমি ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে এই বীণা বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। তোমরা যে জগতে আছ, সেই জগত হারিয়ে নূতন জগত পেয়েছি; তুমি না বুঝে আমাকে সংসারিণী বল্‌ছ। যার এক সংসার সেই সংসারী। আমি যে অনন্ত সংসারের গৃহিণী।

মায়াদেবী।—তুই যেমন কলঙ্কিনী, আমাকেও তাই করতে চাস্‌। নারীর সতীত্বই ধর্ম্ম! সতী স্বামীকেই চায়, জগৎকে চায় না।

যোগমায়া।—কিন্তু—বসন্তসখা ত চিরদিনের নহে—স্বামী যদি জগৎপতিতে আশ্রয় লাভ করেন? তবে তাঁহাকে বাঁধ মানাতে সতীকেও যে জগৎ চাইতে হয়। নতুবা স্বামীকেও সে হারায়। তখন ত আর স্বামী স্বয়ং এসে ধরা দেবেন না। স্বামী যে শুদ্ধির পথে গেছেন, সেই বিশ্বপথে প্রয়াণ করে জ্ঞানাগ্নিতে মকরধ্বজমূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে দুঃখময়ের সেবাদাসী হওয়াতেই জগৎপতির আশ্রিত স্বামীকে পুনরায় মিলে। তবেই সতী,

নহিলে অসতী। সৎকে ভজনা না করিলে সতী কিসে? বিশ্বপতিই সেই সৎ। সর্ব্বঘটে বিশ্বরূপের ভজনা না করিয়া অন্যরূপে আসক্ত হওয়া বৈধ অধিকার নহে। উহাই কাম-চারিতা।

মায়াদেবী।—কাম? এ হাতে লোহা, এ সীমন্তে সিন্দূর, মা বিশ্বেশ্বরীই ত পরাইয়া দিয়াছেন! তবে দম্পতীর ভোগে নিষেধ কোথায়? সীমা কোথায়? তিনি আনন্দের জন্যই প্রেম দিয়াছেন, দুঃখের জন্য নয়। মা আমার আনন্দময়ী।

(স্বগত) মাগো! তোমার দানে আজ আমার সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? শুদ্ধি কোথায়? আজ তোমার আনন্দের এই দুর্গতি! এই সর্ব্বনাশিনী আসিয়াই তোমার আনন্দময় সংসারকে ছারে খারে দিল!

যোগমায়া।—জ্ঞানের মূল্যেই সে প্রেমের, দুঃখের মূল্যেই সে আনন্দের, ঋণ পরিশোধ হয়। জ্ঞানাগ্নি দিয়া কোমল হৃদয়কে দগ্ধ করে পরে সেই পোড়া কঠিন পাথুরে হৃদয় শীতল করে করুণায়

ভেজাতে হয়। তারপর উৎসর্গের পালা। জীবই এই উৎসর্গের আধার, কিন্তু সে জীবে বিশ্বমূর্ত্তির আভাস পাওয়া চাই। শুধু বিশেষকে দিয়া হয় না, বিশেষের সহিত বিশ্বকে পাওয়া চাই। তবেই প্রবৃত্তি শুদ্ধ হয়। তাই বলি মায়া! আজ বিশ্বপথে এই জ্ঞানাগ্নিতে স্বামীকে উৎসর্গ করে যিনি প্রেম দিয়াছেন তাঁর ঋণ পরিশোধ কর।

বোন, তোমার সোণার স্বপন ভেঙ্গেছে, তাই বলে শোক করিও না। সংসারকে সত্যিকার করে গড়ে নাও। তাহাতেই শান্তি। তাহাতেই শুদ্ধি।

মায়াদেবী।—(স্বগত) মা বিশ্বেশ্বরি! তোমার মনে এই ছিল। ঘর ভাঙ্গিবে যদি তবে গড়িয়াছিলে কেন? গড়িলে যদি, তবে আবার ভাঙ্গিলে কেন? এ ভাঙ্গা ঘর যোড়া দিবে কে? এই যোগমায়া? এই বিশ্বঘরণী মহামায়াকে আমার ঘরে স্থান দিতে হবে! না, না, তা হবে না, কখনই হবে না! (প্রকাশ্যে) হেঁ, এমনি

করে একবার স্বামীকে ছেড়ে দিলে তোরই সুবিধা, আমার উৎসর্গে তুই ভোগ করিস্। আমি কি তোর খেয়ে মানুষ, যে ঋণের দায়ে স্বামীকে বিক্রি করব।

বিশ্বেশ্বরীর আগমন।

বিশ্বেশ্বরী।—মায়া! চুপ কর। তুমি কাহার সহিত এমনভাবে কথা বলছ জান না। যোগমায়ার তোমার স্বামীতে কোন লাভ নাই। সে ভোগ করিতে জানে না। যাহারা ভোগী তাহারা বৈরাগ্যমূলক প্রেমের দীক্ষা ইহার কাছেই গ্রহণ করে। এ সন্ন্যাসিনী, আপনার যাহা কিছু ছিল তাহা বিস্মৃত হয়ে, সকল অলঙ্কার পরিচ্ছদ ছেড়ে, আপন শরীরে স্বপ্রকাশ হয়ে আছে। উহার রূপ সকল আধারে, সকল শরীরে! ও যে বিশ্বদলহাসিনী। তুমি ওকে চেননা। সে রূপের অপার্থিব সৌন্দর্য্য তোমার নয়নে ভাসে না। কিন্তু তোমার স্বামী তাহাতে মুগ্ধ হয়েছেন। সে রূপ সাধারণ, অবারিত, বিশ্ব-পথে দণ্ডায়মান, কিন্তু তাহাতে কোন কলঙ্ক

স্পর্শে না। তাহা বিশ্বরূপেরই বিলাস। এই নারীদেহে বিশ্বপতির অলখরূপ বিজলীর ন্যায় খেলিতেছে। যোগমায়াকে দিয়াই বিশ্বপতিকে জানিতে হয়।

মায়া! তুই আমার কন্যা,—স্নেহের পুত্তলি। তোকে আমি এই সংসারক্ষেত্রে যাহাতে জীবের কাজে ও ভোগে লাগিস্ তাই প্রেরণ করেছিলাম। তোকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমার মায়ের প্রাণ যেন আধারচ্যুত হয়েছিল। কিন্তু জগতের জন্য তোকে উৎসর্গ করেছি এই ভেবে ত্যাগেও শান্তি ছিল। মায়া! তোমাকে নিয়ে জীব সংসারক্ষেত্রে কিছুকাল সুখে বাস করবে, শিশুমনের খেলাঘরের সাধ মিটবে, জীবের ক্ষুৎপিপাসা দূর করে তুমি অন্নপূর্ণারূপে গৃহলক্ষ্মী হয়ে সংসার উজ্জ্বল করবে, এই কাজেই তোমাকে এখানে পাঠান হয়েছে। কিন্তু এই কর্ম্মে বৈরাগ্য অবলম্বন করে নিজের ক্ষুৎপিপাসা ভুলিতে হয়। পরের অন্তরের মলিনতা দূর করতে গিয়ে নিজেকে শুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু মায়া! তুমি আজ কোথায় নিজের কর্ম্ম বিস্মৃত

হয়ে প্রেমের ভোগলালসায় ও বিলাসে, প্রেমের অধিকারে ও ঐশ্বর্য্যে, আপনাকে ডুবাইয়া দিলে! মায়া! নিজের বিচ্যুতিতে তুমি সংসারে এ কোন্ মায়াবিনী সৃজন করেছ। তোমার উদ্ধার চাই, নতুবা জীব তোমার করালগ্রাসে পতিত হইলে জগৎও ছারখারে যাবে। একমাত্র যোগমায়াই তোমাকে উদ্ধার করিতে পারে। তুমি তাহার কাছে বৈরাগ্যমূলক প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ কর।

বিশ্বেশ্বরের প্রকাশ।

বিশ্বেশ্বর।—পরিণয়ে মৃত্যু, নিয়তির আদি অভিশাপ। সংসারক্ষেত্র পরিণয়ক্ষেত্র। তাই তাহাতে সেই অভিশাপ লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অভিশাপ হতে মুক্তি পাবার জন্য যোগমায়া একমাত্র সম্বল। যে সংসারী সংসারিণী যোগমায়াকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহারা এই সংসারেই মুক্তি পায়। এই বিশ্বপথে দণ্ডায়মানা, বিশ্বরূপবিলাসিনী, বিশ্বদলবাসিনী যোগমায়াকে ছেড়ে পরিণয়রূপী যুগলপ্রেমে মুক্তি নাই। বিশ্বেশ্বরি! সচ্চিদানন্দের বিগ্রহ, সে ত যুগল-

বিগ্রহ নয়, সে যে অনন্তরূপী, কারণসাগরে অনন্তশয্যাশায়ী!

একটী রহস্য কথা শুন। বিশ্বেশ্বরী ব্রত-উদ্‌যাপনে উৎসর্গ করিলেন তাঁহার কন্যা মায়াকে। তাই মায়াকে এই সংসারে অন্নপূর্ণা-রূপে পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। যোগ-নিদ্রাভঙ্গে দেখি আমার ভোলা মা মায়ার অজ্ঞাতসারে কোথা হতে এক অসুরমায়া আসিয়া সংসারে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়েছে। সেই অসুর-মায়ার কৃষ্ণনীল আলুলায়িতকেশ স্বর্ণতারকা-খচিত। কণ্ঠে মণিমালা, শিরায় হীরার জাজ্বল্য-মান কিরীট, কিন্তু তার বাম হস্তে মদিরাপাত্র, দক্ষিণ হস্তে পুষ্পবাণ। সে মায়াকাননে ছদ্ম-বেশে প্রবেশ করে, মায়ার শরীর ধারণ করে, জীবকে বিলাসবিষে জর্জ্জরিত করেছে। সেই স্মেরমুখী কেবল সেই ভাণ্ড হতে জীবকে মদিরা পান করাইয়া চৈতন্য প্রদান করে, কিন্তু সে চৈতন্য বিকারগ্রস্ত, সে প্রেম উন্মাদপূর্ণ। সেই অসুর-মায়ার ললাটে আগুনের ফুল্‌কি, লেখা—কালপরি-ণয়! বুঝিলাম—নিয়তির আদি অভিশাপ!

জানিও এই অসুরমায়ার হাত হইতে মায়া-দেবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই বিশ্বেশ্বর তাঁহার মানসকন্যা যোগমায়াকে এই সংসারে পাঠাইয়াছেন।

বিশ্বেশ্বরি আজ হতে জীবের দুই সংসার, মায়া ও যোগমায়া। মায়া জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া স্বেচ্ছা ও স্বাধীনতার পথে ভোগের ভিতর দিয়া জীবচৈতন্যকে অনন্তসময়ক্রমে বাড়াইয়া তুলুক। মায়া বিশ্বেশ্বরীর কন্যা, স্বভাবশুদ্ধা, তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ করে না। সে যে নিকৃষ্টের বাসনায় উৎকৃষ্টকেই পাইতে চায়। আর যোগমায়া বিশ্বপথে ডাকিয়া লইয়া জীবমায়ার বাসনাগুলিকে জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মোহান্ত চক্ষু ফুটাইয়া মোহিনী অসুরমায়াকে ব্যর্থ করে মুক্তির পথে উন্মুক্ত ব্যোমমার্গে লইয়া যাক্।

যোগমায়া।—প্রভু! আমি কিছুই করিতে পারি না। কেবল তোমার মহিমা অঙ্গে ধারণ করিয়া যুগে যুগে প্রতি জীবকে তোমার অনন্তরূপ দেখাই। কিন্তু তুমি যে দীনের হৃদয়াসনে আসিয়া অধি-

ষ্ঠান না কর, তাহার মোহান্ত-চক্ষু ফুটে না। আমার বীণার তন্ত্রে তোমার সেই ছন্দোবদ্ধ সপ্তস্বর করুণ রাগিণীতে বাজাইতে থাকি, কিন্তু তুমি যদি আকাশ হইতে কর্ণকুহরে বজ্র বর্ষণ না কর, তবে কেহ জাগিয়া উঠে না। তুমি সকলের পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, যুগে যুগে আপন বিরজব্রহ্মপদ ছাড়িয়া মানবকে মুক্তি দিবার জন্য মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যবাসীর ন্যায় আপন মর্য্যাদা হারাইতেছ। আমি প্রভুর কোন কাজেই লাগি নাই। জীবের কলঙ্ক ও মলিনতা কেবল প্রভুই শুদ্ধ করিতে পারেন। আমি এখনও শুদ্ধ হইতে পারিলাম না। তাই আমি সুধার স্বাদে কেবল জীবের মনে বিদ্রোহ আনিয়া শান্তিভঙ্গ করি। সে তখন বিশ্বকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে চায়, কিন্তু গড়িতে ত জানে না।

বিশ্বেশ্বর।—এই বিদ্রোহের পর যে শান্তি, তাহাই যথার্থ শান্তি। যে শান্তিরাজ্যে মানবের জন্ম, সে অজ্ঞানের শান্তি। একবার বিদ্রোহী হইলে তবেই শান্তিকে জ্ঞানে পাওয়া যায়। আর অন্তিমে, জ্ঞানপথের শেষে, পরাশান্তি, যাহা

জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত। তুমি মায়াদেবীকে ঠিক পথে লইয়া আসিয়াছ, সে এবার শান্তি পাবে। সে নিজের হাতে সোণার সংসার ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, আবার সে সংসারকে নূতন রসে পূর্ণ করে গড়ে নেবে।

মায়াদেবী।—(স্বগত) আমার সে সুখ কোথায় গেল? সেই সোণার সংসার? আজ কেবল অবসাদ, বিতৃষ্ণা, বিকারবোধ। আবার সংসারকে সুখের করতে গেলে যোগমায়াকে আমার গৃহে স্থান দিতে হবে! এ সেই মহামায়া, সেই শতদলবাসিনী! (প্রকাশ্যে) এখন দেখিতেছি যুগলপ্রেমে শান্তি নাই। দ্বন্দ্বের পরিণতি অবশেষে দ্বন্দ্বেই হয়। তিনের সংসারেই সুখ। বোন্ যোগমায়া! এস আমাদের সংসারে। এ সংসারে আজ তোমারই উচ্চস্থান, লক্ষ্মীর আসন। আর আমি আমার স্বামীকে মাঝে রেখে তাঁর মধ্য দিয়া তোমাকে ভালবাসব। তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও তোমার হৃদয়কোণে স্থান দিও।

যোগমায়া।—আমি তোমাদের সংসারে আজীবন আছি,

এখনও থাক্‌ব। এতদিন প্রতিবন্ধক হয়েছিলেম, আজ থেকে তোমাদের বন্ধু হয়ে থাক্‌ব।

স্বামী।—মায়া! যোগমায়া! এস দুজনে দুপাশে, মায়া বামে, যোগমায়া দক্ষিণে, আর আমি তোমাদের মাঝে। ইহাতেই অসঙ্গতির সঙ্গতি, অশান্তির শান্তি। আজ আমাদের সকলের ক্ষুধা মিটিল, এ সংসারে কেহ অভুক্ত নাই। এই সংসারই আনন্দময়ধাম।

৩—মা-হারা

জগৎ-মাতা　　　জগৎ-পিতা

আমি

হৃদয়

জ্ঞান

(স্থান—গোলকের সীমানা)

আমি।—ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, নিম্নে এই হরিদ্‌বরণা ধরণী। ঐ নীল হইতেই সবুজের সৃষ্টি। কিন্তু মাঝের সেই পীত কৈ? পীত ও নীলের সমাবেশ ব্যতীত এ সবুজ হয় নাই। ঐ নীল আর এই সবুজের মাঝে ত এক মহাশূন্য, সেই শূন্যে পীতের কোনো আভাস পাই না। হায়! আমার পীত কোথায় গেল? না, না, এই ত দেখি, পীত আছে হরিৎএ মিলাইয়া। তাই বুঝি বসুন্ধরার হরিদ্‌-বরণ আঙ্‌রাখার তন্তুতে তন্তুতে পীতের ক্ষীণা-ভাস। আর সম্বৎসরের হরিৎ জীর্ণ হইয়া যে

শরতের চীরবাস প্রস্তুত হয়, সেই শরৎও বিদায়-কালে পুনরায় পীতের মহিমাই অঙ্গে ধারণ করে। তাই পাকা পীতের সন্ধান হরিৎ বিনা হয় না।

এই যে প্রাচীন ধরণীবক্ষে আমাদের নবীন জীবনধারা, ইহার সৃষ্টিও কি এই নিয়মেই? ঊর্দ্ধে, আকাশে পিতা, ও নিম্নে, ধরণীর অঙ্গে অন্তর্হিতা মাতা,—এই শক্তিদ্বয়ের সমাগমেই কি জীবের সৃষ্টি হয় নাই? পিতা আছেন বৈকুণ্ঠে, এইরূপ শ্রুতি আছে, একটা আবহমানকাল হইতে জনশ্রুতি! মর্ত্ত্যে আমরা তাঁরই সন্তান, কিন্তু মা কোথায়? মার কথা ত শুনি না। আমরা সবাই মা-হারা! ভগবান যে আদ্যা-প্রকৃতি-শরীরের মধ্য দিয়া এই জীবসমষ্টি সৃষ্টি করিলেন, আমাদের সেই গর্ভধারিণী আমাদের জন্ম দিয়া ধরণীর অঙ্গে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন? জননীই যে ভগবানের মর্ত্ত্যে অব-তরণের সোপান। যে কারণ-সাগরোদিতা মহালক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া ভগবান তাঁর স্বরূপে জীবকে সৃষ্টি করিলেন, আপনার উৎসর্গে আপনি

অপূর্ণ হইলেন, সেই সঙ্গিনীকে ত আর দেখি না! তাঁর স্থান আজ শূন্য! বিশ্বের মা নাই! করুণা কোথায়? আমি এই গোলকের পর-পারে আসিলাম, নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশে, কিন্তু এখানে এক মহাশূন্যের ব্যবধান,—ঠেকিয়া গেলাম! সোপান বিনা উঠিব কি করিয়া? কে আমায় বাপের কোলে তুলিয়া দিবে? হায়! মা থাকিলে বুঝি আজ শূন্যের ভিতর হইতে একটি হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া নিতেন, ও তাঁর বক্ষে বাঁধিয়া এই গোলকের সীমানা হইতে ঐ শূন্যের অপারে পিতার সমীপে লই-তেন! আমার মা কোথায় গেল? এ খুনে-জগতে বুঝি মায়ের স্থান শূন্য! যমাবতার Dis একদিন ধরণীকন্যা প্রসূনপাণি Perse-phone-কে Hades-এ লইয়া গিয়া আজীবন আঁধার রাজ্যে রুদ্ধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা প্রসূনপাণির বিরহে ধরণীতে শস্যের অভাব দেখিয়া জগৎপিতা Zeus জীবের জন্য বৎসরান্তে তাঁকে এক একবার মুক্তি দিতেন। আমার উদ্ধারের জন্য কি আমার জননীর সন্দর্শন

একবারের মতও মিলিবে না ? জননী না হইলে উদ্ধার করিবে কে ?

হৃদয়।—এ যুগে সন্তানই একমাত্র জননীর উদ্ধারের সোপান। মাতা সন্তানকে মুক্তিপথে লইয়া যাইতে অক্ষম। সন্তানকেই আগে জননীর বন্ধন মোচন করিতে হইবে। আজ সংসারে জননী স্বাধিকারচ্যুতা, দাসীরূপে রূপান্তরিতা। সন্তান-ধারণ করিতে গিয়া আজ তাঁর স্বতন্ত্রতা নাই।

আমি।—হায় ! তাই বুঝি জগৎ-মাতা জন্মের মত অদৃশ্য হয়েছেন। জীবকে সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি কালমুখে পতিত !

হৃদয়।—না, জগৎ-মাতার শরীর, রক্তমাংস, সকলই এই বিরাট জীবসমষ্টিরই শরীরে। তাঁর রূপ বিশ্ব-মানবের রূপে, যেমন হরিৎএ পীতের লুপ্তপ্রায় আভাস। তিনি আজ মূর্চ্ছিতা।

আমি।—হায় ! আমি এতদিন ভাবিয়াছিলাম যে জীবই বুঝি সংসারক্ষেত্রে কালচক্রে বদ্ধ। এখন দেখি জগৎ-জননীও আমাদের সহিত এই মায়াপুরীর মায়াজালে বন্দী ! আমাদের মুক্তি বিনা জগৎ-

জননীর কি মুক্তি নাই। আমাদের মুক্তি নিজের নিজের স্বেচ্ছা ও স্বতন্ত্রতার পথে, কিন্তু হায়! সেই করুণাময়ী জগৎ-জননীর স্বতন্ত্র মুক্তি নাই, তাঁর আশা জীবেরই লক্ষ্যে, তাঁর উদ্ধার জীবেরই সিদ্ধিতে! মানবজগতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির, কার্য্য ও কারণের, জ্ঞান ও হৃদয়ের, পরস্পরে এ বন্ধন কেন? বন্ধন যদি, তবে আবার ব্যবধান কেন? মধ্যে কেন এ ফাঁক? জড়-জগতে ত এমনতর নয়। সেখানে এ পরমুখাপেক্ষিতা নাই। আর যদিই বা থাকে, সে ত শরীর দিয়া শরীরের বন্ধন, রূপে রূপ গাঁথা, মাঝে কোনো অরূপের ব্যবধান নাই। অজ্ঞান দুর্ব্বল শিশু আমরা, কেমন করিয়া এ ব্যবধান কাটাই, কেমন করিয়া জননীকে ফিরিয়া পাই!

সন্তান আমরা মায়াপুরে রুদ্ধ, আমাদের মাতা জ্ঞানহারা, আত্মচ্যুতা, আর পিতা মুক্ত, পিতা অচ্যুত! বৈকুণ্ঠের এ কোন্ রীতি?

জ্ঞান।—না, তাঁর সেই রূপ, সেই দিক, যাহা বিশ্বমাতৃকার শরীরের ভিতর দিয়া মর্ত্ত্যে চৈতন্যরূপে উদ্ভাসিত,

প্রতিবিম্বিত, সেই বিম্বটুকু তোমাদেরই মত মায়ার ফাঁদে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁর স্বরূপ মুক্ত, যাহাতে তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর ও তোমাদের পিতা। সেই স্বরূপটিও রূপ, রূপের মুক্ত দিক। এবং সেই স্বরূপের পশ্চাতেও আবার একটি অরূপ আছে, যাহা প্রকাশাপ্রকাশের অতীত।

আমি।—অরূপের কথা বুঝি না, কিন্তু তাঁর স্বরূপ যদি মুক্ত, তাঁর প্রকাশ মুক্ত নয় কেন? তিনি ত স্বপ্রকাশ, তবে তাঁর প্রকাশে বাধা কি? অপ্রকাশ যদি পূর্ণ, যদি শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, তবে তাঁর প্রকাশ কেন পূর্ণ হইবে না?

জ্ঞান।—সত্য। যাহা ছিল, তাহাই আছে, তাহাই থাকিবে। যাহা নাই, তাহা ত্রিকালে নাই। ইহাই পরমার্থদৃষ্টি। রূপও অরূপের মতই পূর্ণ, সে যে অরূপের রূপ। এই ত্রিকালসিদ্ধ পূর্ণ রূপটিই ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানে রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান, তাই অপ্রকাশিত অনন্ত ভবিষ্যৎ-রূপের তুলনায়, বর্ত্তমানের প্রকাশটুকু খণ্ডপ্রকাশ। এই প্রকাশের পথেই ভগবানের

রূপ নিজেকে ব্যক্ত করিতেছে, কলায় কলায় বৰ্দ্ধিত হইতেছে।

আমি।—হয়ত বা একদিন মর্ত্ত্যে পূর্ণিমা আসিবে; তবে সেই রূপের অনন্ত উন্মুক্ত দিকই আমাদের ভবিষ্যৎ-ভগবান, যাঁহাকে আমরা জানি না, যাঁর আগমন ত্রিলোক প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু যে রূপ জানি, যে রূপ নয়নে নয়নে উদ্ভাসিত, যে ভাষা শ্রবণে শ্রবণে প্রতিধ্বনিত, যে মধু প্রতি রসনার আস্বাদে, যে সৌরভ প্রতিমানবের নিঃশ্বাসে, যে স্পর্শ সকল অঙ্গের অনুভূতিতে, সেই যে আমাদের পরিচিত ভগবান, তিনি আমাদেরই মত মায়াপুরীতে রুদ্ধ।

জ্ঞান।—হাঁ, এই জ্ঞানের প্রকাশ সীমাবদ্ধ, জ্ঞানই সেই প্রকাশের সীমা। এমন কি, ভবিষ্যৎ-ভগবান *যিনি মুক্ত, তিনিও জ্ঞানের সীমানায় আসিয়া ধরা পড়িতেছেন। কিন্তু ভগবৎ-রূপের যে দিক জ্ঞানে আসিলেও জ্ঞানচক্ষের সামনে আসিয়া পড়ে না, অন্তরালে থাকে, সেই রূপ, সেই দিক,* চিরমুক্ত। যেমন শিল্পীর কৌশল ক্রমে ক্রমে তার কলাপ্রণালীতে ব্যক্ত হইতে থাকিলেও সদাই

সেই প্রকাশের পশ্চাতে একটা অব্যক্ত পূর্ণরূপ আছে। সেই রূপটিই শিল্পীর স্বরূপ কিন্তু সে রূপও আবার এক অখণ্ড রসের জন্য, আর সেই রসই নীরূপ, নিরাকার, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত।

আমি।—তবে ভগবানে যেমন এক অব্যক্ত অরূপ আছে, যাহা নিরাকার, নিগুর্ণ, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত, তেমনি তাঁহাতে একটি অব্যক্ত রূপও আছে, যেটি তাঁর স্বরূপ, ও যাহা তাঁর প্রকাশিত রূপের অন্তরালে সদাই বিরাজমান। সেই অন্তরালের রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান হইলেও তাহা ত্রিকাল-সিদ্ধ, তাহাতে উপচয় অপচয় নাই। কেবল যে কালজ্ঞানে প্রকাশিত, সেই জ্ঞানের ক্রম-পরম্পরায় হ্রাসবৃদ্ধি, জোয়ার-ভাটা, জন্মমৃত্যু।

জ্ঞান।—হাঁ, এইরূপই বটে। সকল খণ্ডপ্রকাশের অন্ত-রালে থাকে একটি অপ্রকাশ।

আমি।—বীণার তন্ত্রীতে সুরটি বাজিলেও সুরের কতখানি অনাহত ও অশ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কে বলিবে। যে কথা বলিতে চাই, তাহার বেশী-টুকু বলিতে পারি না। আর সেই অনাহত

অশ্রুত অব্যক্ত অবোধ্য সর্ব্বাবশিষ্টই ত্রিকালের ভগবান। তিনিই মুক্ত।

জ্ঞান।—সেই মুক্তকে পাইলেই তোমার মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞান ত অংশে অংশে পায়। তাই অনন্ত সময়-ক্রমেও অনন্তকে পায় না। অংশ অংশ করিয়া অনন্তকে শেষ করিবে কেমনে? অবশিষ্ট অব-শিষ্টই থাকিয়া যায়। মাতাই পিতাকে সমগ্র-রূপে জানিয়াছেন, সন্তান নয়। তাই সন্তানের জ্ঞান দিয়া নয়, মাতার হৃদয় দিয়া, পিতাকে পাইতে হয়। মাতাকে জাগাইয়া না তুলিলে জীবের গতিমুক্তি নাই।

জ্ঞান।—মাতা নিজেই বদ্ধ, মাতাকে মুক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—সন্তান। মাতাকে মুক্ত করিয়াই নিজে মুক্ত হবে।

আমি।—পিতা ও মাতা পরস্পরকে সহায় করিয়া আত্ম-দানে এই সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে পিতার যদি একটি বিশ্বাতীত মুক্ত রূপ থাকে, মাতার কেন নাই? মাতার আত্মদানের পশ্চাতে একটি অদেয় অংশ নাই?

হৃদয়।—না। জ্ঞানে যাহা প্রকাশ, তাহা রূপ, খণ্ডরূপ। হৃদয়ে যে স্ফূর্ত্তি, সে রস-স্ফূর্ত্তি, আর রসমাত্রই নীরূপ, তাহাতে খণ্ডাখণ্ড জ্ঞান নাই।

জ্ঞান।—জ্ঞানেরই একটি অদেয় অংশ থাকে, হৃদয়ের থাকে না। জগৎ-পিতা চিন্ময়, জ্ঞানরূপী। জগৎ-মাতা মায়া, হৃদয়রূপিণী। তাই সৃষ্টিতে, প্রতি-জীবদেহই জ্ঞান ও হৃদয়ের আধার। তোমার মাতা হইলেন সৃষ্টিক্রিয়ার একটি উপাদান। জ্ঞান কর্ত্তা, হৃদয় উপকরণ। আর এই উপকরণ হওয়াতেই মাতার আত্মদান পূর্ণ হয়। যেমন শিল্পীর কলাকার্য্যে শুধু শিল্পীর বুদ্ধি নয়, কিন্তু পট তুলি রঙ্ও সহায়। কিন্তু শিল্পী জ্ঞানী, তাই শিল্পবস্তুটিতে তার প্রকাশ পূর্ণ নয়। কিন্তু ঐ যে অজ্ঞানের দান, পট তুলি রঙ্,—তাহাদের পরিণতি ঐ কলাকার্য্যের রূপবিন্যাসে ও বর্ণ-ভঙ্গিমায়। সেই পট তুলি রঙ্ই ঐ চিত্রের আকারে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শকের নিকট প্রকাশিত। ইহাই অজ্ঞানের সম্পূর্ণ দান, কিন্তু জ্ঞানের দান অপূর্ণে, অংশে অংশে, নিত্য নূতনে। জগৎমাতার দান অজ্ঞানের দান,

তাই তাঁর নিঃশেষ পরিণতি। এই যে পরিণামী বাস্তবজগৎ, এই যে জীবসমষ্টি, এই যে মানব-সংসার, ইহাদের সকলেরই আশ্রয়ভূমি সেই জগৎ-মাতার মায়াময় দেহ। যাহাতে জন্ম, তাহাতেই আশ্রয়, আবার তাহাতেই লয়। তাই মানবদেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে পঞ্চভূতের উদয়। তাই পর্ব্বত-শিলার ক্ষয়ে আবার ধূলাবালির সৃষ্টি। উদ্ভিদের দেহনাশে জীবনরূপী তাপ কয়লার খনিতে আশ্রিত। তারকার ধ্বংসে আবার অসংখ্য উল্কার ছুটাছুটি। সাগরের অতলে মুক্তার নিষ্ফলতায় আবার চূর্ণের পাহাড়ের সৃষ্টি। অজ্ঞানের দান এই উপাদানেই। কিন্তু তোমার পিতার অংশ আছে এই জগতের প্রাণে, এই জগতের চৈতন্যে, তাঁর সত্তা এই জগৎ-রূপী মহাপ্রাণীর সমষ্টিপ্রাণ ও সমষ্টিচৈতন্য, নানা আধারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও গতির কারণ। তিনি গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া সৃজন করিতেছেন, বিশ্বব্যূহ রচনা করিতেছেন। তিনি স্বরূপে ব্যূহাতীত, ব্যূহের বাহিরে। এই গতির বাহিরে তিনি অচল, তিনি মুক্ত। তাঁর সৃষ্টি তাঁকে পূর্ণ করিয়া পায় না।

আমি।—তাঁকে আর পূর্ণ করে পেতে চাই না। যতই তাঁকে জানি, ততই জানি না। যত বেশী পাই তত বেশী পাই না। যা পেয়েছি, যা চিনেছি, তাই ভাল। তাঁকে পেতে গিয়ে আমি তাঁরে আপন মলাতে মলিন করি, ক্ষুদ্র জ্ঞানের পিঞ্জরে রুদ্ধ করে ক্ষুদ্র করি। তাঁকে আর পেতে চাই না। তবে শুধু সেই দাতার দানটি তাঁর চরণে নিবেদন করে যাই। আর এই দান-পথেই যদি একদিন,—যদি একদিন—আঁধারে তাঁর চরণ স্পর্শ করি! জ্ঞান চাই না। জ্ঞানেই যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই জ্ঞানের নাশ করে একদিন বা আবার আঁধারে মিলিতেও পারি। সেই ঘোর আঁধার রাত, শুধু তাঁর হাতে হাত, শুধু শিশুর আশ্বাস, শুধু অজ্ঞানের বিশ্বাস! হায়, এ সর্ব্বনেশে জ্ঞানের নাশ করিবে কে? কে জ্ঞানী? জীব না ভগবান? এই জীবকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত ভগবান অপূর্ণ? আপনাকে জীবদেহে মাতার ন্যায় পূর্ণভাবে বিতরণ করিলেন না কেন? তবে কি জগৎ-পিতার এই আদি অবিবেচনা হেতুই তিনি মর্ত্ত্যে

ও বৈকুণ্ঠে উভয় ধামেই অপূর্ণ ? তাই তাঁর এই দ্বিরূপ, দুই খণ্ড। আর সেই খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে পাবার জন্য এত ব্যাকুল! কে বলে বৈকুণ্ঠে তিনি পূর্ণ, স্বরূপে তিনি মুক্ত! তাঁর ক্রোড় আজ শূন্য! তাঁর বিগ্রহ কোথায় ? আজ অখণ্ড চায় খণ্ডকে, খণ্ড চায় অখণ্ডকে। সবাই আত্মহারা!

জ্ঞান।—জ্ঞানের সমগ্রে ও অংশে বিচ্ছেদ নাই, তাহাতে মায়া নাই, বন্ধন নাই। সে কেবল আছে হৃদয়ের। এই যে খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে চাহিতেছে, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া।

আমি।—আদিতে কে ছিল ? জ্ঞান না হৃদয় ?

জ্ঞান।—অরূপের কথা জানিনা, কিন্তু আদিরূপ এক,—যুগল নয়। কিন্তু সে জ্ঞান, না, হৃদয়, তা কেহ জানে না। সেই একেরই আত্ম-দানে দুইএর সৃষ্টি, আর সেই দুইএর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও হৃদয়ের আবির্ভাব। উভয়ের যুগপৎ প্রকাশ, আর সেই প্রকাশেই বুঝি যে জ্ঞানরূপী জগৎপিতাই আপন অংশে হৃদয়রূপিণী মাতাকে সৃজন করিয়াছেন।

আমি।—তা হলে ত তাঁদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ? তবে কেন বিচ্ছেদ? কেন বিরহ? শুধু জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মধ্যে ব্যবধান নয়, পিতা ও মাতার মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিধি।

জ্ঞান।—পরিণয়ে মৃত্যু, ইহাই নিয়তির আদি অভিশাপ। "সন্তানদেহে মাতার মাধুরী বিলুপ্ত। সন্তান পিতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত। আর পিতা, সন্তান ও পত্নী উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন।" ইহাই নিয়তি ঘোষণা করিয়াছে। দেবনরতির্য্যগ্‌যোনি, স্বর্গ-মর্ত্ত্যপাতাল, সকলই নিয়তির বজ্রশৃঙ্খলে বাঁধা। এ নিয়তি খণ্ডন করিবে কে? দম্পতীকে এ অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবে কে?

আমি।—মানবের গৃহে গৃহেই এই অভিশাপ লাগিয়া গিয়াছে দেখি! এ অভিশাপের আদি কোথায়?

জ্ঞান।—নিয়তির আদি নির্ণয় করিবে কে? আদিসর্গেও পিতামহ Kronos (মহাকাল) পুত্রঘ্ন পুত্র-গ্রাসোম্মুখ, আর পিতা Zeus (দ্যোঃপিতর্, দ্যাবাপৃথিবী) বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিভুবনে জনক "মহাকাল"কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, এইরূপ

কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। আর তির্য্যগ্-যোনি জৈবধারায়ও দেখিতে পাই যেমন একদিকে আদি-জননীর সন্তানপ্রসবে নিজ দেহত্যাগ, তেমনি অপর দিকে আদি পিতা সন্তানবিরোধী, এমন কি সন্তানঘাতক, আর সন্তানও পিতৃদ্রোহী, যূথপতিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে একছত্র অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায়।

আমি।—বুঝিলাম বীজেই এই অভিশাপ। এ অভিশাপের শেষ কোথায়? আজ মর্ত্ত্যে গৃহে গৃহে পিতা ও পুত্রে এই বিরোধ, তত্ত্বে তত্ত্বে আদর্শে আদর্শে নিরন্তর সংগ্রাম। একজন ভূতের প্রতিনিধি, অপরে ভবিষ্যতের বার্ত্তাবহ। আদিম পুত্রের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাতেই বুঝি মর্ত্ত্যে জন্মমৃত্যু, ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। তাই ঘরে ঘরে সেই আদম-বিদ্রোহ আজও অভিনীত হয়। এ অভিশাপের শেষ কোথায়?

জ্ঞান।—কই শেষ ত দেখি না। রসপর্য্যায়েও এই বিরোধ। সন্তানপালনের নিমিত্ত গৃহিণী নারীকে

মাধুরী বর্জ্জন করিতে হয়। জননী আর রমণী নহেন। সেইরূপ উজ্জ্বলমধুররসে রসবতী নারীও কখনও জননী নহেন। তাই উর্ব্বশী চিরনগ্নিকা, রাধা চিরবন্ধ্যা, আর তাই যোগমায়া কাহারও জায়া বা জননী নহেন।

আমি।—এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

জ্ঞান।—এই রসে রসে বিরোধ বলিয়াই ত বৈকুণ্ঠেশ্বরী আজ পতিত্যাগিনী, মর্ত্ত্যে সন্তানদেহে অবতীর্ণা। বৈকুণ্ঠধামে পতিকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবে নিজেকে নিঃশেষ বিকাইয়া দিয়াছেন। তাই বৈকুণ্ঠেশ্বর আজ বিরহী। তাঁর বামপার্শ্ব শূন্য। তিনি মধুররসে বঞ্চিত।

আমি।—তবে বৈকুণ্ঠেশ্বর মিলনযোগে চিরবঞ্চিত?

জ্ঞান।—জ্ঞানে যোগই ছিল, যোগই আছে। কেবল হৃদয় আসিয়াই যত ব্যবধান, বিচ্ছেদ, বিরোধ! তাই জ্ঞানে হৃদয়ের সৃষ্টিকে নির্ম্মূল না করিলে নিয়তির অভিশাপ হইতে মুক্তি কোথায়?

আমি।—তবে সন্তানের নিমিত্তই জগৎ-পিতার এই চির-বিয়োগ! আমি ছার জীব, চাই না তাঁকে

পেতে, চাই না তাঁকে জ্ঞানে। এ তুচ্ছ মিলনে কি তাঁর বিরহ দূর হবে? এ ক্ষুদ্র হৃদয় আজ পিতৃচরণে আত্মনিবেদন করে আত্মহারা হতে চায়। কিন্তু নিজের হৃদয় দিয়া সেই সর্ব্বহৃদয়ার প্রেম কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র মনের বেদনাও কত অল্প, সকল জীবের আশ্রয়স্বরূপা বিশ্ব-হৃদয়ার মর্ম্মভেদী বেদনার কতটুকু ধারণ করিতে পারি? আমি করি কি? হে পিতা, আমার একা নিবেদনে ত মাতার বন্ধনমুক্তি নাই। আজ যদি ঐ প্রাণীসমষ্টি, ঐ অসংখ্য নরনারী, তোমার চরণে সকলে একবারে আত্মবলিদান দেয়, তবেই বুঝি তুমি তোমার বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাও! আর সেদিন আবার বৈকুণ্ঠে যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করে! হে পিতা, বজ্রবর্ষণে আমাদের সংহার করে এই করাল গ্রাস হইতে জননীকে মুক্তি দাও! তোমার অর্দ্ধাঙ্গকে মুক্তি দিয়া চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠধামে সেই হিরণ্ময়-কোষে উজ্জ্বলমধুর রসের যুগল-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান কর! আমাদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ মিথ্যা জীবলীলার

দরুণ বৈকুণ্ঠে নিষ্ফলতা ! দোলমঞ্চ, রাসমণ্ডল, সিংহাসন, সকলই শূন্য ! কি লজ্জা ! কি ঘৃণা ! জীবের কলুষিত প্রেম রসাতলে যাক্ !

হৃদয়।—বৈকুণ্ঠে নিষ্ফলতা ? জগৎ-মাতা সন্তানের জন্য স্বেচ্ছায় পতিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মাধুর্য্য উপভোগে তাঁর প্রেম পূর্ণ হল না, তাই বাৎসল্যে আপনাকে নিমগ্ন করেছেন। জীবকে বিনাশ করলে সেই প্রেমময়ীকেও বিনাশ করা হবে। তা হলে পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে কোনো মতেই পাবেন না।

আমি।—মাগো ! সত্যই কি তবে তুমি আমাদের জন্য পিতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছ ? কেন মা ! এই অবোধ শিশুদের জন্য এই মলাধূলা, এই কলুষ, বহন করিলে ! হে পিতা ! হে মাতা ! সন্তান-দের সংহার করে তোমরা উভয়ে কলুষমুক্ত হও, তাহাতেই আমরাও মুক্ত হব। তোমরাই যে আমাদের আশ্রয় !

হৃদয়।—জীবদেহই আমার আশ্রয়, আমার আধার। আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছি। আমাকে

একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাও ? জীবের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক, জীবের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, সকলই আমার বিহারক্ষেত্র, আমার যে অন্য ক্ষেত্র নাই! জীবের ভীতি ও আশা, লজ্জা ও ঘৃণা, বিরহ ও মিলন, সামর্থ্য, ও অসামর্থ্য, সকল দ্বন্দ্বই আমার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, আমার যে অন্য প্রাণ নাই! জীবের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, সকল রসই আমার রস, আমার যে অন্য প্রেম নাই! আমাকে আধারচ্যুত করিতে চাও ?

জ্ঞান।—এ সকলই অজ্ঞান, আমারই আশ্রিত। আমি ছাড়িয়া দিলেই ত শূন্য হইয়া যায়। সেই ভাল। তখনই ত সর্ব্বমুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞানের আশ্রিত ? ইহাদের কোন্‌টার উপর তুমি দাবী করিতে চাও বল দেখি ? ইহাদের ভোগে তুমি অনাহূত, অনিমন্ত্রিত। তুমি কাহারও নও, তোমারও কেহ নয়। কিন্তু ভোগের শেষে সেই যে মীমাংসা, সেই মীমাংসাটুকুর জোরে, সেই মীমাংসার উপর আধিপত্য করে, তুমি,

জ্ঞান, আমাকে সমূলে বিনাশ করিতে চাও? তোমার ঐ নির্ম্মম সর্ব্বগ্রাসী করাল দৃষ্টি হতে লুকাইবার জন্যই বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে জীবের জন্য বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছি। আজ তুমি সে অধিষ্ঠানও কাড়িয়া লইবে? নির্ব্বাসন থেকেও নির্ব্বাসিত করিবে? আমি তোমার ঐ চোখকে ডরাই। ও চোখ যেখানে পড়ে, সব শূন্য হইয়া যায়, সব ধূ ধূ করিতে থাকে।

আমি।—হৃদয় দিয়াই পিতাকে জেনেছি, হৃদয়ই মাতাকে উদ্ধার করবার একমাত্র সম্বল। যেদিন হৃদয়ে হৃদয়ে সর্ব্বহৃদয়া জাগবে, তখনই জগৎ-পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে পাবেন। আর তখন সন্তানের হৃদয়ই পিতা-মাতার ব্যবধান না হয়ে মধুর-রসের মিলনভূমি হবে। এবার জ্ঞানের যুক্তি বিচার মীমাংসা সংহার করে হৃদয়কে বন্ধনমুক্ত করবার পালা। তবেই মাতার মুক্তি। আজ জ্ঞানকে সংহার করিব। জ্ঞানের দরুণই বিচ্ছেদ। জ্ঞানেই এই ফাঁকা, এই নিরালম্ব।

জ্ঞান।—চৈতন্যকে সংহার? আমিই ত জীবে জীবে

চৈতন্য। আমাকে সংহার করিলে, হে হৃদয়-রাণী, হে মায়াবন্ধনঘটনপটীয়সী, তোমার মায়া তিষ্ঠিবে কোথায়? তার সার্থকতা কোথায়? হৃদয়কে বিকাইয়া দিবে, কিন্তু আমি বিনা সে হৃদয়কে তুলিয়া লইতে জানে কে? তোমার দান গ্রহণ করিতে জানে কে? আর আমি যদি দান ভোগ না করি, তবে, হৃদয়, তোমারই বা করুণার মহিমা ব্যক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—আমি ত তোমাকেই চাই। বৈকুণ্ঠে যে হিরণ্ময় যুগলধাম আছে, এই জীবদেহ, তোমার আমার আধার, সেই আদর্শেই গঠিত। জীবে জীবে আমাদের যুগলমূর্ত্তি। আমরাই আদর্শ দম্পতী। জগৎ-পিতা যে জগৎ-মাতাকে চায়, সে ত জ্ঞানের হৃদয়কে চাওয়া, জগৎ-মাতা যে জগৎ-পিতাকে চায়, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া। আজ সে বৈকুণ্ঠে বিরহ, আজ আমাদের প্রেম-লীলাভূমি জীবে বিরোধ। প্রাণে প্রাণে জীবে জীবে আমাদের মধুর মিলন চাই, তবেই ভগ-বানের বিরহ ঘুচিবে, তবেই তিনি তাঁর মধুর রসের বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাইবেন।

আমি।—বুঝিলাম। এই জ্ঞান ও হৃদয় সেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতারই বিলাস। একজন মায়াতে নির্লিপ্ত, একজন নরনারীদেহে ছিন্নভিন্ন। জীবই তাঁহাদের মিলনের অন্তরায়, আবার জীবই তাঁহাদের মিলনের সোপান। জীবের স্বেচ্ছা-সামর্থ্যের উপর ভগবান ভগবতীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে! জ্ঞানের সৃষ্টিতে, জ্ঞানের দানে, সর্ব্বদাই এইরূপ একটি তৃতীয়ের স্থান আছে, যাহার ভিতর দিয়াই দুইএর সার্থকতা, অথবা যাহার জন্যই দুইএরই নিরর্থকতা, নিষ্ফলতা! জ্ঞানরাজ্যে এ অভিশাপ কেন? এ অপেক্ষা, এ পরতন্ত্রতা, কেন? এ বিচ্ছেদ, এ ব্যবধান কেন? আজ আমিই সেই জ্ঞানরাজ্যে মূর্ত্তিমান অভিশাপ! হায়! কেমন করিয়া এই অভিশাপ হইতে মাতাকে মুক্তি দিব!

মাগো! একবার ভাল করিয়া জাগো! আর নীরব হইয়া থাকিও না। হৃদয়ের অন্তঃপুর ছাড়িয়া একবার চোখের সামনে দাঁড়াও, এই নিঠুর ধরণীবক্ষে সেই করুণাময় সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দাও।

তোমার মনের কথা বল! মাগো! তুমি কি চাও? কিসে তোমার মুক্তি? জানি না, মাগো হয় ত বা তুমি এই ভাবেই মুক্ত! অবোধ আমরা কিছুই বুঝি না। তুমি আমাদের সকলের মা। আজ আর এই তোমার কন্যার কাছে নীরব হইয়া থেকো না। কি চাও বল, তোমার সকল জ্বালা সকল বেদনা তোমার অভাগা কন্যা সহিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াও একদিন বুঝিয়াছি, পতিকে আমাদের জন্য বিসর্জ্জন দিতে তোমার করুণ প্রাণে কি ব্যথা! তাই বুঝি তুমি মূক হইয়া আছ। স্বেচ্ছায়

অনন্তসাগরবক্ষে ভাসাইয়া সখা
মূক আর্ত্তনাদে তুমি তীরে পড়ি একা!

জগৎ-মাতা।—বৎসে, মধুররস বড়ই মধুর, কিন্তু তাহা বিসর্জ্জন না দিলে বাৎসল্যের অধিকার কোথায়? একটিকে ত্যাগ না করিলে অপরটিকে পাওয়া যায় না। একদিন আমি তাঁহারই একমাত্র আদরিণী সোহাগিনী ছিলাম। কিন্তু আজ সে সোহাগ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরমপতিকেই

তোমাদের রূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সেই ভগবান আমার পতি, তিনিই আজ অংশে অংশে আমার সন্তান। আজ নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিল। নারীজীবন আজ ধন্য। সেই জগৎ-পতিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমি জগৎ-মাতার পদে আরূঢ়া! আর তাই আজ জগতে নারীমূর্ত্তিই ধন্য! তাই সংসারে সংসারে নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়াছে। এমনি করিয়াই মাতৃত্বের ভিতর দিয়া পতিকে তাঁর পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। নতুবা পতি ও পত্নীর ব্যবধান অনতিক্রমনীয়, বিরহও নিত্য। সন্তানরূপে পতিকে লাভ করিলে বিবাহ-ডোর সার্থক হয়, সে বন্ধন আর শিথিল হইতে পারে না। সন্তান ও জননী যে একই রক্তমাংস, একই দেহমনপ্রাণ। তাই সেথায় বিরহ বিচ্ছেদ ব্যবধান নাই। তাই মর্ত্ত্যে যুগলমূর্ত্তি সন্তান ও মাতাকে লইয়াই। এই পূর্ণ ভগবান স্তনদাত্রী মাতার শরীরে স্বপ্রকাশ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভগবানকে নিজদেহে ধারণ করিয়া তাঁর অনন্তরূপ দেখানই আমার কাজ।

বৎসগণ, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। কিন্তু জানিনা আজ সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের হৃদয়ে কিসের দুঃখ, কিসের বিরহ। এইমাত্র বুঝি এই সন্তানদের ভিতর দিয়াই তিনি একমাত্র আমাকে পাইতে পারেন। যদি তাঁর প্রাণ আমার জন্য কাঁদে, তবে হে জীব, হে সন্তান, তুমিই একমাত্র তাঁর সান্ত্বনা। তুমি তাঁর চরণে আপন হৃদয় নিবেদন করিয়া তাঁর বিগ্রহ আনিয়া দাও। ভগবানের বিগ্রহরূপিণী আমি, জীবদেহে অবতীর্ণা, তাই জীব ব্যতীত তাঁর আমাকে পাইবার আর কোনো উপায় নাই। এই জীবসমষ্টিই আজ তাঁর বিগ্রহের স্থান পূর্ণ করিতে পারে।

আমি।—আমার হৃদয়ে মা আমার জেগেছে। এই যে তাঁর বাণী শুনিতে পাই। বুঝিলাম আমার হৃদয় আজ আর আমার নয়, সেই জগৎ-মাতার! আর তাই আজ হৃদয় এমন উদাস হয়ে বৈকুণ্ঠের পানে ছুটে যেতে চায়! আজ এই যে চাওয়া, এ ত সন্তানের পিতাকে চাওয়া নয়, এ যে মাতার পিতাকে চাওয়া। মা আজ

আমার উঠেছে! এই যে গোলকের সীমানায় কত কাঁটা ঝোপ, কত নির্জ্জন বন্ধুর কান্তার, কত অন্ধ গিরিসঙ্কট, কত ছায়াময় মৃত্যুপথ অতিক্রম করে এসেছি, এ যদি মায়ের হৃদয় না হত, তবে কি এমন করে এই অকূলের সন্ধানে আসতে পারতাম। সেই মায়ের হৃদয় পাগল হয়ে আমাকে এদিকে এনেছে। আজও মাতা পিতাকে চায়। তবে তাঁহার প্রেম তিনি ব্যক্ত করেন না, সন্তানকেই পূর্ণ করবেন বলিয়াই। আমাদের হৃদয়ে যে বিরহবোধ জাগে, সে ত মায়ের বিরহ। মন আমার, একবার সেই বিরহকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তোল। বিরহ যত গাঢ় হবে, মিলনও তত সম্পূর্ণ হবে। আর তবেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মাধুর্য্য আরও মধুর হয়ে উঠবে।

আজ আমার হৃদয় জেগেছে। কিন্তু সকল জীবের হৃদয় না জাগলে ত হৃদয়েশ্বরী জাগবে না। আজ আমি এই গোলকের সীমানা হইতে ফিরিয়া যোগমায়াব মত বিশ্বপথে দাঁড়াইয়া আমার বীণা বাজাইতে থাকি। অঙ্গে সেই

মায়ের দেওয়া গৈরিক, মায়ের গীত। গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে, ঘুরিয়া, এই বীণার স্বরে হৃদয়ে হৃদয়ে বৎসল মাধুর্য্য জাগাইয়া তুলি। যাহাতে প্রতি প্রাণ উদাস হয়ে তাঁর দিকে ছুটে, পথের ধারে ধূলাখেলা ছেড়ে তাঁর ক্রোড়ই একমাত্র আশ্রয় বলে জানতে শেখে।

না, এ ত ধূলাখেলা নয়, এ যে জীবন মরণ লইয়া খেলা! আদি জননী মরিয়া সৃষ্টিকে যে প্রাণদান করিলেন,—নিয়তির শাসনে, মরা ছাড়া সেই মৃত্যুঋণ শোধ করিবার অন্য পন্থা নাই! কিন্তু মায়ের মত সংসারে বুক পাতিয়া মৃত্যুশেল ধারণ করিবার শক্তি আছে কার? জ্ঞান আত্মকাম, তাই মরিতে জানে না। নিজের জন্য মরা, সে যে মরণের জন্য মরা! তাহা ত সম্ভবপর নয়। হৃদয় পরার্থপর, তাই মরিবার সাহস আছে, শক্তি আছে। পরের জন্য মরা, সে যে জীবিতেরই সেবায়,—জীবনেরই জয়! তাই আদি জননী সৃষ্টিতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া প্রাণদান করিয়াছেন। সেই হৃদয়েশ্বরী জীবের হৃদয়ে জাগিলেই জীবও মরিয়াই মৃত্যুঞ্জয়!

এই মৃত্যুপথ অতিক্রম করে গোলকের সীমানায় না আসিলে বৈকুণ্ঠপ্রয়াণে অধিকার নাই। আমি এই পথেই আসিলাম, এখন ফিরিয়া গিয়া যোগমায়ার বীণা বাজাইয়া বাজাইয়া সৃষ্টিকে এই পথে ডাকিতে থাকি। যুগে যুগে মায়ের আবেশে প্রাণে প্রাণে মৃত্যুঞ্জয়ের লীলা সাধিত হউক! লীলান্তে গোলকের সীমানায় দাঁড়াইয়া এই বীণার সুরে ঐ বৈকুণ্ঠধামের পথে —বৈকুণ্ঠপ্রয়াণে—আবাহন করি, মায়ের বিরহ জাগিয়ে তুলে বিরহাসক্তিতে উদাস করে তাদের প্রাণভরে কাঁদাই। তারা যেন হা পিতা হা পিতা বলে সেই জগৎপিতার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ে! শেষের সে দিন, হায় সে দিন কবে হবে!

জগৎ-পিতা।—(আকাশবাণী) ধন্য জীব! সার্থক তোমার জন্ম! সার্থক তোমার প্রেম! তোমার মাতা আজ মূর্ত্তি পেয়েছেন। হে কন্যা! সকল জীবের প্রতিনিধি তোমার মাঝে আজ আমি সেই বিশ্বমাতৃকাকে দেখেছি।

* * * * * *

হৃদয়।—(স্বগত) এমনি করিয়াই নিয়তির অভিশাপ খণ্ডিত হয়। রসে রসে বিরোধ ঘুচিয়া যায়। যেখানে একটিমাত্র রস, সেখানে মাধুর্য্য নাই। তিনটি রস না মিশিলে মধুররস হয় না। তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেত ফুটিয়া উঠে। যুগল, সন্তান, পিতামাতা, তিনটি উপকরণ। মা ত শুধু মা নন্, পিতার বিগ্রহরূপিণীও তিনি, আবার পিতাও শুধু পিতা নন্ কিন্তু মার পতি। পত্নী শুধু পত্নী নন্, কিন্তু সন্তানের জননী, পতিও শুধু পতি নন্ আবার সন্তানেরও জনক। আর তাই সন্তানসেবা করিতে করিতে কালে পতি-পত্নীর যুগলপ্রেমেও একটা বাৎসল্যের আভাস আসিয়া পড়ে। তেমনি আবার কালে পুত্র বাপমার বাপ, ও কন্যা মা হইয়া দাঁড়ায়। তাই দেখি যেখানে কেবল দুই, সেখানে একটিমাত্র যুগ্ম, একটিমাত্র রস। যেখানে যুগ্মের সম্পর্কে তৃতীয় আছে, সেখানে কোনও না কোনও ছাঁদে দুই দুই করিয়া তিন যুগ্ম, তিন রস, সম্ভবপর হয়। আবার তিন রসে তিন যুগ্মরস, আবার তাহা হইতেও তিন, এইরূপে তিনে তিন অনন্ত ধারায়

সূচী

ত্রিবেণী-সঙ্গম

শ্রীসরযূবালা দাস গুপ্তা

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—১॥০ দেড় টাকা।

'দিদু'র

উদ্দেশে—